সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ২৭ নভেম্বর ২০২৩ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ০৯-১০

কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি

কিং ফায়সাল ইউনিভার্সিটি

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ০৯-১০
* বার : সোমবার

◈ ২৭ নভেম্বর-২০২৩ ঈসায়ী
◈ ১২ অগ্রহায়ণ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ১৩ জমাদিউস্ আউয়াল-১৪৪৫ হিজরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **আল-কুরআন : রিসালাতের বলিষ্ঠ প্রমাণ**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - **তাক্বওয়া : গুরুত্ব ও ফলাফল**
    সংক. : শা. মু. ইব্রাহীম আ. হালিম মা.- ১৩
  - **রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা**
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১৮
- **সাহাবা চরিত :**
  - **খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ই বিশ্বের মুসলিম মহিলাদের আদর্শের প্রতীক**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ২৩
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - **ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে সৃষ্টি করা হয় ইসরাঈলী রাষ্ট্র**
    মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম- ২৫
- **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - **ক্বওমে লূতের ধ্বংসের বিবরণ**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩০
- **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ৩৪
- **সমাজচিন্তা :**
  - **বক্তা-শ্রোতা ও মাহফিল আয়োজক : সকলের জানা জরুরি**
    লেখক : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল- ৩৬
- **কিশোর ভুবন :**
  - **আমি অজগর! আমাকে ভয় পেও না**
    মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ, অনুবাদ : হাফিজুর রহমান- ৩৭
- **কবিতা** ৩৯
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৪০
- **শুব্বান সংবাদ** ৪২
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৪
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

আহলে হাদীস আন্দোলন : একটি সংশয়ের জবাব

সংগ্রাম বা আন্দোলন শব্দটির সাথে এক ধরনের যুদ্ধংদেহি ভাব মিশে থাকলেও ইতিবাচক অর্থে আন্দোলন বা সংগ্রাম একটি চেতনার নাম। অশুচি সমাজ ব্যবস্থাকে শুচি-শুভ্র করার একটি প্রক্রিয়া। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেমন দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে থাকে, তদ্রূপ এ উপমহাদেশ থেকে শির্ক-বিদআত দূরীকরণে আহলে হাদীসদের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসও প্রাচীন। বিশেষ করে নিখিল-বঙ্গ ও আসামে মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ-২)-এর হাতেই আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রাণ সঞ্চারিত হয়; যা পরবর্তীতে প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ-২)-এর হাত ধরে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়।

এই আন্দোলন বা সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের সংস্কার সাধিত হয়। এটি ব্যক্তি বা কোনো দলের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, আর না কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি মানুষের 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের সংস্কার বা সংশোধনের প্রচেষ্টার নাম। কোথাও কোনো ব্যক্তি বা সমাজে 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের ত্রুটি দেখা দিলে আহলে হাদীসগণ কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে সে ভুল-ত্রুটির সংস্কার ও সংশোধনে ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হন না, কিংবা কোনো নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কাও করেন না; বরং তারা সালাফে সালেহীনের বুঝ ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রমাণ-পঞ্জি দিয়ে মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দেন। আর এভাবেই সাহাবায়ে কেরাম-এর যুগ হতে এখন পর্যন্ত নিজ গতিতে এ আন্দোলন-সংগ্রাম চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে ইন্শা-আল্লাহ। এ সংস্কার কাজে যে বা যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাচনিক সাহায্যপ্রাপ্ত বলে তারাই বিবেচিত হবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মাতের একদল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত করতে চাইবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" এ আন্দোলন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় প্রচার শুরু করেছে। আর ভবিষ্যতে সে অবস্থায় ফিরে যাবে, যেভাবে অপরিচিত অবস্থার সূচনা হয়েছিল। অতএব এ 'গুরাবা' বা অপরিচিত জনদের জন্য সু-সংবাদ।"

এখনে 'গুরাবা' বা সু-সংবাদ প্রাপ্ত অপরিচিতজন কারা? "গুরাবা বা সু-সংবাদপ্রাপ্ত তারাই, যারা আমার পর মানুষদের বিকৃতকৃত সুন্নাহ সংশোধন করবে।" অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ)-এর কোনো সুন্নাহ মানুষ বাদ দিয়ে দেয় এবং কোনো কোনোটি বিকৃত করে ফেলবে। ঠিক সে সময় যারা আমার বিকৃত বা মৃতপ্রায় সুন্নাতকে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে 'আমলে বাস্তবায়ন করবে, তারাই জান্নাতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত গুরাবা বলে বিবেচিত হবে। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, রাসূল (ﷺ) তার দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের গুরুদায়িত্ব এ উম্মাতের স্কন্ধে অর্পণ করে গেছেন। এ উম্মাতের মহান দায়িত্ব হলো কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং এ দু'টির প্রচার ও প্রসারে সর্বদা নিয়োজিত থাকা। যতক্ষণ এ মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য উম্মাত পালন করে যাবে, ততক্ষণ তারা সকলপ্রকার বিভ্রান্তি হতে মুক্ত থাকবে। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।"

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, আহলে হাদীস একটি সংস্কারবাদি আন্দোলনের নাম। এর আদর্শ ও চেতনাগত স্বাতন্ত্রিকতা বোদ্ধা মহলে স্বীকৃত। এটি সাহাবীগণের সোনালি যুগ হতে নিপুণভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। অবস্থা ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় সেটির ছন্দে বৈচিত্র্যময়তা দেখা দিলেও মূল আদর্শ ও নীতি হতে কদাচিৎ বিচ্যুতি ঘটেনি; বরং স্থির লক্ষ্যপানে অবিচল থেকে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। 'আক্বীদাহ্ ও 'আমল সংশোধনের এ আদর্শিক সংগ্রামকে ভারতবর্ষে 'আহলে হাদীস আন্দোলন' বলা হয়। এ আন্দোলন দেশ, জাতি বা ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর আবেদন বিশ্বময়। কাজেই এটিকে কোনো অঞ্চল বা বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে খাস করা কোনোভাবে সমীচীন হবে না। ইসলাম যেমন সার্বজনীন ও বিশ্বময়, তেমনি 'আহলে হাদীস আন্দোলনও বিশ্বময়। সৎ ও ন্যায়বান মুসলিম ইসলামকে তার দীন বলে পরিচয় দেবে– এটাই স্বাভাবিক। কোনো সংকীর্ণমনা ব্যক্তি বা বিশেষ জনপদ 'ইসলাম' পরিভাষা ব্যবহার করলে আমরা উদারমনের জনগণ সে পরিভাষা ব্যবহার করবো না, তা হতে পারে না। তদ্রূপ আহলে হাদীস আন্দোলনের পরিভাষা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্যগত নাম। এটি অন্য কেউ ব্যবহার করলে করতে পারে– এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই বলে সত্য ও ন্যায়ের চিরসেবক আমরা কখনো 'আহলে হাদীস আন্দোলন' এ পরিভাষা ব্যবহার হতে বিরত থাকতে পারি না; বরং আমাদেরকে এ পরিভাষা বেশি বেশি ব্যবহার করতে হবে, যাতে এ আদর্শ কুক্ষিগত বা বিলীন হয়ে না যায়।

অতএব আসুন! আমরা আদর্শিক চেতনার এ সংগ্রামে সক্রিয় হই। শির্ক, বিদআত ও সামাজিক নানাবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত জাতির সামনে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে স্ব-জোরে বলি– আমি মুসলিম, আমি আহলে হাদীস। আমার আন্দোলন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। আর তা হচ্ছে– আহলে হাদীস আন্দোলন। ব্যাপক অর্থবহ এ পরিভাষা কোনো এক বিশেষ শ্রেণিতে আবদ্ধ থাকতে আমরা চাই না। ❑

সূচীপত্র

আল কুরআনুল হাকীম

আল-কুরআন : রিসালাতের বলিষ্ঠ প্রমাণ

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۞ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

“আর আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো এবং মহান আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডেকে আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারপর তোমরা যদি তা করতে না পারো এবং তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না। তাহলে তোমরা সে আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর –যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।”[১]

দারসের বিষয়বস্তু

গত দারসে মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাত-এর বলিষ্ঠ প্রমাণ পেশ করার পর চলতি দারসে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি প্রেরিত রিসালাত এর অকাট্য প্রমাণ ও দাবী সন্নিবেশিত হয়েছে। সাথে সাথে মহানবী (ﷺ) যে, আল্লাহর বান্দাহ- রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতে তার কোনো দখল নেই- সেকথা অতি চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। উপরন্তু মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহর ক্বালাম ও শ্রেষ্ঠ মুজিযাহ্, তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

আল-কুরআন অকাট্য মুজিযাহ্

‘উমার, ইবনু মাস‘উদ ও ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنهم) প্রমুখাত বাচনিক উক্তি উল্লেখপূর্বক ইমাম ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের প্রতি এই মর্মে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আল-কুরআন মহান আল্লাহর ক্বালাম হওয়ার ব্যাপারে কারো সন্দেহ হলে সে যেন এর অনুরূপ তৈরি করে দেখায়। আল্লাহ তা‘আলা একাধিক আয়াতে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

﴿أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾

“তারা কি বলে, তুমি কুরআন তৈরি করেছ? বলো– তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডেকে নাও! যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”[২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴾

“বলুন! যদি মানব ও জিন্ এ কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।”[৩]

মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ্ (رحمهما الله) বলেন, এভাবে আল্লাহ তাঁর নবী (ﷺ)-এর মাক্কী জীবনে সন্দেহবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের পর ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا﴾ আয়াতখানা নাযিল করে চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রাখেন। এভাবে সন্দেহবাদীরা মহান আল্লাহর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অপারগ হয় এবং আল কুরআন

---

* *সম্পাদক,* সাপ্তাহিক আরাফাত। *সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল,* বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস।

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩-২৪।*

[২] *সূরা হূদ : ১৩।*

[৩] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ৮৮।*

মহান আল্লাহর ক্বালাম ও শ্রেষ্ঠ মুজিযাহ্ একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।[৪]

রিসালাতের বলিষ্ঠ প্রমাণ

তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতিই হলো ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। এ দু'টি পরস্পরের সম্পূরক। সূরা আল বাক্বারার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তার উলুহিয়্যাতের দাবী তুলে ধরেন। অতঃপর ২২ নং আয়াতে তার দাবীর যৌক্তিকতা উল্লেখ করতঃ তার তাওহীদের নিরংকুশ দাবী প্রমাণ করেন। আর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতদ্বয়ে রিসালাত মেনে নিতে আহ্বান জানান। কেননা রিসালাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন না করলে তাওহীদের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় না। মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এ কথার বড় দলিল হলো মহানবী (ﷺ) অক্ষরজ্ঞান শূণ্য ব্যক্তি। কুরআন আরবী ভাষায় অলংকার সমৃদ্ধ কিতাব। তিনি তা রচনা করতে পারবেন না। তা আরবরা ভালো করেই জানে। তাই আল্লাহ তা'আলা আরবদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করার আহ্বান জানান। এ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) মহান আল্লাহর রাসূল এবং কুরআন মহান আল্লাহর ক্বালাম। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং তার আনীত শরিয়তকে অগ্রাহ্য করবে সে কাফির বলে অভিহিত হবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[৫]

রিসালাত ও উবুদিয়াত

মহান আল্লাহর বাণী– ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ "যা আমি নাযীল করেছি আমার বান্দার উপর" আয়াতাংশে উল্লিখিত عَبْدِنَا "আমার বান্দা" বলতে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে নাম না নিয়েও আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদ-এ নাম উল্লেখপূর্বক তা স্পষ্ট করে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾

"আর মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা নাযীল করা হয়েছে, তাতে ঈমান আনয়ন করো।"[৬]

ঈমান বা বিশ্বাসের একটি মানদণ্ড হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) যে মহান আল্লাহর বান্দা এ কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেয়া। তাহলে বিভ্রান্ত থেকে বাঁচা সম্ভব। আর এর মাঝেই তার প্রতি সঠিক ও যথার্থ ইনসাফ নিহিত রয়েছে। উলুহিয়্যাত কিংবা রুবুবিয়্যাতে তার কোনো দখল নেই। তিনি গায়েব জানেন না। মানুষের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতাও তার নেই। তিনি মহান আল্লাহর বান্দা –এ কথার প্রমাণ আল কুরআন, সহীহ হাদীসে বিদ্যমান। এ সকল প্রমাণের মধ্য হতে দু'একটির উল্লেখ করছি। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"পরম বরকতময় আল্লাহ, তিনি যিনি তার বান্দার প্রতি ফায়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হয়।"[৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বসা পর্যন্ত রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন।"[৮]

মহানবী (ﷺ) বলেন,

«لَا تُطْرُوْنِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ، وَرَسُوْلُهُ».

"মারইয়াম পুত্র 'ঈসাকে নিয়ে খ্রিষ্টানরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো কোনো একজন বান্দা। তোমরা বলো, মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"[৯]

অতএব, উপরোক্ত দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর বান্দা বলে বিশ্বাস করবে,

---

[৪] *আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাফসীর ইবনু কাসীর- দারুস সালাম, রিয়াদ, ৪৩।*

[৫] *শাইখ 'আব্দুর রহমান 'আস্ সৌদী। তাফসীর কারীমির রহমান (সংক্ষেপিত) মুফাস্সারাতুর রিসালাহ- বাইয়াত, ৪৫।*

[৬] *সূরা মুহাম্মাদ : ২।*

[৭] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ১।*

[৮] *সূরা বানী ইসরা-ঈল : ১।*

[৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৪৫।*

সে মহানবী (ﷺ)-কে নিয়ে অহেতুক বিতর্কে জড়াবে না। মহান আল্লাহর দেহের অংশ, গায়েব জানা, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, ত্রাণকর্তা ইত্যাদি যা কেবল মহান আল্লাহর সিফাত, তাতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অংশীদার মনে করবে না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন পূর্বক শির্ক-এর মহাপাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

জাহান্নামের ইন্ধন

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের ইন্ধন اَلْحِجَارَةُ বা পাথর বলেছেন। এখানে اَلْحِجَارَةُ বা পাথর বলতে দুর্গন্ধযুক্ত কালো পাথর উদ্দেশ্য। কেননা তা অধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী। আবার কেউ কেউ পাথর দ্বারা ঐ সব মূর্তিকে বুঝিয়েছেন, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার 'ইবাদত করা হত।[১০]

জাহান্নামের অস্তিত্ব

মহান আল্লাহর বাণী– ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾ কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে– যারা সুন্নাহপন্থী 'উলামা তারা এ মর্মে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, জাহান্নাম সৃষ্ট ও বিদ্যমান। আর একথার সমর্থনে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাদীস নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ : يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِيْ الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِيْ الصَّيْفِ.

"জাহান্নাম তার রবের অনুমতি প্রার্থনাপূর্বক আরয করল; হে প্রতিপালক! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। অতঃপর তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং অপরটি গ্রীস্মকালে।"[১১]

অতএব একথা সহজেই অনুমেয় যে, জাহান্নাম বিদ্যমান না থাকলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হত না এবং জাহান্নামকে বছরে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হত না। তাছাড়া সাহাবী ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক প্রমুখাত রিওয়াত এই যে, একটি পাথরখণ্ড ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামের মুখে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তা গভীর তলদেশে পৌঁছাতে এ দীর্ঘ সময় লেগে যায়।[১২] এর দ্বারা কি একথা প্রমাণ করা যায় না যে, জাহান্নাম সৃষ্ট ও বিদ্যমান নিশ্চয়ই।

দারসের শিক্ষাসমূহ

১. কুরআন মহান আল্লাহর কালাম, এটি সৃষ্ট কোনো বস্তু নয়। এটি মহান আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত শ্রেষ্ঠ মুজিযাহ্।

২. মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা। উলুহিয়্যাত বা রুবুবিয়্যাতে তাঁর কোনো দখল নেই।

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান না আনলে এবং তার আনিত শরিয়তকে বিশ্বাস না করলে কোনো ব্যক্তি তাওহীদপন্থী ঈমানদার হতে পারে না।

৪. তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান না করলে কাফির বলে গণ্য হবে। চাহে নিজেকে যতই সাধু বলে দাবী করুক না কেন?

৫. জাহান্নাম সত্য। এটি মহান আল্লাহর মাখলুক, যা তিনি মূলতঃ কাফিরদের শাস্তির জন্য তৈরি করেছেন। জাহান্নাম বিদ্যমান, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

উপসংহার

উপর্যুক্ত শিক্ষাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নিজ কর্তব্যবোধের পরিচয় দিতে হবে। আর এতেই রয়েছে আমাদের জন্য পরমসুখ ও শান্তি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খাঁটি উম্মাত হওয়ার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ❑

দু'আর আবেদন

সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সিনিয়র সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন এর মাতা বার্ধক্য জনিত জটিল রোগাক্রান্ত হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছেন।

তাঁর আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করুন –আমীন।

---

[১০] *আল মিসবাহুল মুনির ফী তাফসীর ইবনু কাসীর- দারুস সালাম, রিয়াদ, ৪৫।*

[১১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩৭।*

[১২] *সহীহ মুসলিম।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى الله عنه) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

সরল অনুবাদ

“আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন।”[১৩]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মাইমুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– ‘হে বিড়ালের পিতা’! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারী’র মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

দরুদ পাঠের গুরুত্ব : দরুদ শব্দটি ফারসি, দরুদ অর্থ হলো শুভ কামনা, কল্যাণ প্রার্থনা। পরিভাষায় দরুদ বলতে ‘আস্ সলাত আলান নবী’ অর্থাৎ- নবীজির প্রতি দরুদ পাঠ বা তাঁর জন্য শুভ কামনা, তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর দয়া, করুণা প্রার্থনা বুঝায়। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নাম উচ্চারণের সময় সর্বদা ‘সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ (**অর্থ :** মহান আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা হয়, যা একটি দরুদ। মহান আল্লাহর কাছে সমুদয় ‘ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণযোগ্য করতে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ অন্তরে নিবিষ্টভাবে নবী কারীম (ﷺ)-এর ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা নেক ‘আমল।

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ﷺ)-কে রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ﴾

“আমি আপনাকেই শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।”[১৪]

হাদীসে দরুদ পড়ার পদ্ধতি, উপকারিতা, না-পড়ার ক্ষতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে। পবিত্র কুরআনেও এর ব্যাপক তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তারা নবীর ওপর রহমত প্রেরণ করেন। হে মু’মিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দু‘আ করো এবং তার প্রতি সালাম পাঠাও।”[১৫]

এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে নবী (ﷺ)-এর ঐ সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে– যা আসমানে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশ্‌তাগণের নিকট বিদ্যমান। তা এই

[১৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭০/৪০৮।*

[১৪] *সূরা আল আম্বিয়া- : ১০৭।*

[১৫] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৫৬।*

যে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাগণের নিকট নবী (ﷺ)-এর সুনাম ও প্রশংসা করেন এবং তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশ্তাগণও নবী (ﷺ)-এর উচ্চমর্যাদার জন্য দু'আ করেন। তার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীদেরও আদেশ করেছেন, যেনো তারাও নবী (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করে। যাতে নবী (ﷺ)-এর প্রশংসায় ঊর্ধ্ব ও নিম্ন দুই বিশ্ব একত্রিত হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালামের নিয়ম তো আমাদের জানা আছে (অর্থাৎ- তাশাহ্হুদে 'আসসালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু' পড়ি) কিন্তু আমরা দরুদ কিভাবে পড়ব? এর উত্তরে তিনি দরূদে ইব্রা-হীমী –যা নামাযে পাঠ করা হয় তা বর্ণনা করলেন।[১৬]

নবী করীম (ﷺ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার সালাত পাঠের অর্থ হলো– রহমত অবতীর্ণ করা। আর ফেরেশ্তাগণ ও মুসলমানদের সালাত পাঠের অর্থ হলো– তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে রহমতের দু'আ করা।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি তার সালাতের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ তার ওযূ না ভাঙ্গা পর্যন্ত ফেরেশ্তারা তার জন্য দু'আ করবেন। তারা বলবে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করো।[১৭]

عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) «اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কাতারের ডান পাশের লোকদের উপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশ্তাগণ তাদের জন্য রহমতের দু'আ করে থাকেন।[১৮]

রাসূল (ﷺ)-এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরুদ পড়ে না তার জন্য তিনি বদদু'আ করেছেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন : সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পড়ল না। সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে রমযান মাস আসলো কিন্তু সে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারল না। আর সে ব্যক্তিও লাঞ্ছিত হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরুদ পড়ে না তার জন্য জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বদ দু'আ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমীন বলেছেন।

কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন : তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত হও। আমরা উপস্থিত হলাম। যখন তিনি মিম্বরের প্রথম সিঁড়ি চড়লেন তখন বললেন, হে আল্লাহ! কবুল করুন। তারপর যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে চড়লেন তখনও বললেন, হে আল্লাহ! কবুল করুন। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে চড়ে আবারো বললেন, হে আল্লাহ! কবুল করুন। খুতবাহ্ শেষে যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনো শুনিনি। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে বলল, যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হলো না সে বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! কবুল করুন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে চড়লাম তখন তিনি বললেন, যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো কিন্তু সে আপনার উপর দরুদ পড়ল না, সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! কবুল করুন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে চড়লাম, তখন তিনি বললেন, যে পিতা-মাতাকে অথবা তাদের কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! কবুল করুন।[২০]

যে দু'আর পূর্বে দরুদ পড়া হয় না সেই দু'আ কবুল হয় না।

عَنْ اَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٍ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ).

[১৬] *সহীহুল বুখারী; তাফসীর সূরা আল আহ্যাব।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৫।*
[১৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৬৭৬।*
[১৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৪৫।*
[২০] *হাকিম; ফাযলুস সালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, হা. ১৯।*

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, যতক্ষণ রাসূল (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়া হবে না ততক্ষণ দু'আ কবুল করা হয় না।[২১]

দরুদ পাঠের ফযীলত

একবার দরুদ পাঠ করলে দশবার রহমত নাযিল হয় : একবার দরুদ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা দশবার রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন, আর তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।[২২]

কিয়ামতের দিন নবীর সুপারিশ পাওয়া যাবে : রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য জান্নাতে উত্তম মর্যাদা প্রার্থনা করা কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশে ধন্য হওয়ার বড় কারণ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوْ (رضي الله عنهما) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَسَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়বে অথবা আমার জন্য উসীলা (জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা)-র দু'আ করবে তার জন্য আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই সুপারিশ করব।[২৩]

সকাল-বিকাল দশবার করে দরুদ পড়া, রাসূল কারীম (ﷺ)-এর সুপারিশ অর্জনের বড় কারণ। হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবূদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরুদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরুদ পড়বে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে।[২৪]

রাসূল (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভ : বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন রসূল (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভের কারণ।

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আমার নিকটতম হবে সেই ব্যক্তি যে আমার উপর বেশি দরুদ পড়ে।[২৫]

যে দরুদ পড়ে না সে কৃপণ : যে ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়ে না সে কৃপণ। হাদীসে এসেছে–

عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পড়ল না।[২৬]

عَنْ اَبِيْ ذَرٍ (رضي الله عنه) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : اِنَّ اَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো, কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পড়ল না।[২৭] রাসূল (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ না করা কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, যে মজলিসে লোকেরা মহান আল্লাহর যিকির করবে না এবং নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়বে না, সেই মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে যদিও নেক 'আমলের কারণে জান্নাতে চলে যায়।[২৮]

---

[২১] *ত্বাবরানী, সিলসিলা সহীহাহ্- আলবানী, পঞ্চম খণ্ড, ২০৩৫।*
[২২] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৯৬।*
[২৩] *ফাযলুস্ সালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, হা. ৫০।*
[২৪] *ত্বাবারানী; সহীহ জামিউস্ সাগীর- হা. ৬২৩৩।*
[২৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৪৮৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, প্রথম খণ্ড, হা. ৯২৩।*
[২৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৪৬।*
[২৭] *ফাযলুস সালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, হা. ৩৭।*
[২৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯৯৬৫।*

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ দরুদ না পড়া : রাসূল (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ না করা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়া ভুলে যাবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে।[২৯]

দশটি সাওয়াব লাভ : একবার দরুদ পাঠ করলে 'আমলনামায় দশটি পুণ্য লেখা হয়।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখে দেন।[৩০]

দরুদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশ্তাদের দু'আ : যতক্ষণ নবী করীম (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা হয় ততক্ষণ ফেরেশ্তারা রহমতের দু'আ করতে থাকেন।

عَنْ عَامِرَ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّ عَلَيَّ اِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ اَوْ لِيُكْثِرْ.

'আমির ইবনু রাবী'আহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন আমার উপর দরুদ পাঠ করে তখন সে যতক্ষণ পড়তে থাকবে ততক্ষণ ফেরেশ্তারা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে, অতএব কম বেশি পড়া তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।[৩১]

দরুদ পড়ার স্থানসমূহ

১. সালাত শেষ করার পূর্বে দরুদ পাঠ করা সুন্নাত। হাদীসে এসেছে–

فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) رَجُلًا يَدْعُوْ فِيْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

ফাযালাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) এক ব্যক্তিকে সালাতে (নামাযে) দু'আ করতে শুনলেন। লোকটি নবী করীম (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করল না। তখন তিনি বললেন, এই লোকটি তাড়াহুড়া করল। তারপর তাকে ডেকে বললেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত পড়বে তখন প্রথম মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে, তারপর নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দু'আ করবে।[৩২]

২. জানাযার সালাতে (নামায) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ পাঠ করা সুন্নাত।

اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ : اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ﷺ) : اَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ الْاِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلَى سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ.

আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাঁকে একজন সাহাবী বলেছেন, জানাযার সালাতে (নামায) সুন্নাত হলো– প্রথমে ইমাম তাকবীর বলবে। প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে, তারপর (দ্বিতীয়) তাকবীর (এর পর) দরুদ পাঠ করবে এবং (তৃতীয় তাকবীরের পর) মৃতের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করবে। কুরআন পাঠ করবে না। তারপর (চতুর্থ তাকবীরের পর) চুপে চুপে সালাম দিবে।[৩৩]

৩. আযান শুনার পর দু'আ পড়ার পূর্বে দরুদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ «اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».

---

[২৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৯০৮, হাসান সহীহ।*

[৩০] *ফাযলুস সালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, হা. ১১।*

[৩১] *সুনান ইবনু মাজাহ্; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, প্রথম খণ্ড, হা. ৯২৫।*

[৩২] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৭।*

[৩৩] *মুসনাদুশ্ শাফে'য়ী- হা. ৭২০৯।*

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনবে তখন তাঁর ন্যায় বলো। তারপর আমার উপর দরুদ পড়ো। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। তারপর তোমরা মহান আল্লাহর কাছে আমার জন্য উসীলার দু'আ করবে। কারণ উসীলা হলো জান্নাতে একটি উচ্চতর মর্যাদা। যা মহান আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু একজনই প্রাপ্ত হবে। আমি আশাকরি আমিই হব সেই ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে উসীলার দু'আ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩৪]

৪. জুমু'আর দিন নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করা চাই। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন,

أَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فإنّهُ ليسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ.

জুমু'আর দিন আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়ো, কারণ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আমার উপর দরুদ পড়বে তার দরুদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।[৩৫] গুনাহ ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দরুদ পড়া সুন্নাত।

৫. দরুদ গুনাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষণ্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়।

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করি। আমি কত দরুদ পড়ব? তিনি বললেন, যত তোমার মন চায়। আমি বললাম, চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরুদ পড়ব। তিনি বললেন, তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে।[৩৬]

৬. রাসূল (ﷺ)-এর নাম শুনা, পড়া কিংবা লেখার সময় দরুদ পড়া সুন্নাত। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন,

«اَلْبَخِيلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হলো কিন্তু সে আমার উপর দুরুদ পড়ল না।[৩৭]

৭. প্রত্যেক মজলিসে নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করা সুন্নাত। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে আল্লাহর স্মরণ করে না এবং রাসূল (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়ে না, তাহলে সেই মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। অতএব তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দিবেন কিংবা তাদের ক্ষমা করে দিবেন।[৩৮]

৮. প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় দরুদ পাঠ করা সুন্নাত। আবূদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُمْسِيْ عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরুদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশ বার দরুদ পড়বে সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে।[৩৯]

দরুদের মাসনুন শব্দ

হাদীসে দরুদ বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে– সেগুলো পাঠ করা যাবে। সংক্ষেপে (صلى الله عليه وسلم) পাঠ করা যাবে। পক্ষান্তরে (اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ) পাঠ করা এই জন্য ঠিক নয় যে, এতে নবী (ﷺ)-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয় এবং এই শব্দগুচ্ছ সাধারণ দরুদে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। আর যেহেতু তাশাহ্হুদে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ শব্দ নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু তাশাহ্হুদে তা পাঠ করাতে কোনো দোষ নেই। তা ছাড়া (اَلصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ) পাঠকারী এই বাতিল বিশ্বাস নিয়ে পাঠ করে যে, নবী (ﷺ) তা সরাসরি শ্রবণ করেন। এই বাতিল বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। সুতরাং এই 'আক্বীদাহ্ নিয়েও নিজেদের মনগড়া দরুদ পাঠ করা ঠিক নয়। অনুরূপ আযানের পূর্বে তা পাঠ করাও বিদআত, যাতে সওয়াব নয়; বরং গুনাহ হয়। হাদীসে দরুদের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। নামাযে তা পাঠ করা ওয়াজিব না সুন্নাত?

---

[৩৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫২৩।*
[৩৫] *হাকেম; বায়হাক্বী- ৩/১১০, সহীহুল জামিউস সাগীর- প্রথম খণ্ড, হা. ১২১৯, মা. শা., হা. ২০৮৮।*
[৩৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৫৭।*
[৩৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৪৬, সহীহ।*
[৩৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩৮০, সহীহ।*
[৩৯] *ত্বাবারানী; সহীহুল জামিউস্ সাগীর- ৬২৩৩, মা. শা., ৬৩৫৭।*

অধিকাংশ উলামাগণ বলেছেন সুন্নাত এবং ইমাম শাফে'য়ী ও আরো অনেকে তা ওয়াজিব বলেছেন। তবে একাধিক হাদীসে তার ওয়াজিব হওয়ারই সমর্থন পাওয়া যায়। অনুরূপ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, যেমন শেষ তাশাহ্হুদে দরুদ পড়া ওয়াজিব তেমনই প্রথম তাশাহ্হুদেও দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব।[৪০]

হাদীসে যে কয়টি দরুদের কথা এসেছে দরুদে ইব্রা-হীমেই ফযীলতের দিক থেকে সর্বোত্তম। দরুদে ইব্রা-হীম হলো–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর এই রূপ রহমত নাজিল করো, যেমনটি করেছিলে ইব্রা-হীম ও তার বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তার বংশধরদের ওপর বরকত নাজিল করো, যেমন বরকত নাজিল করেছিলে ইব্রা-হীম ও তার বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।[৪১]

এছাড়াও যেসব দরুদ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ করো যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।[৪২]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ করো যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম-এর উপর।[৪৩]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ করো যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম-এর উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম-এর উপর।[৪৪]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ করো যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের উপর। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ করো যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।[৪৫]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত বর্ষণ করো।[৪৬]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত।[৪৭]

সালাত ও সালাম তথা দরুদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এক মহিমান্বিত ও বরকতময় দু'আ-প্রার্থনা, যার দ্বারা মহান আল্লাহর বান্দা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি স্বীয় মহব্বত-ভালোবাসার নযরানা পেশ করে। ❑

---

[৪০] *তাফসীরে আহসানুল কুরআন।*
[৪১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৬৯।*
[৪২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৭০৭২।*
[৪৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭৯৮।*
[৪৪] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৯২।*
[৪৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৯০৫, সহীহ।*
[৪৬] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১২৯১।*
[৪৭] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২২৯৮৮।*

প্রবন্ধ

তাক্বওয়া : গুরুত্ব ও ফলাফল

সংকলনে– শাইখ মুহা. ইব্রাহীম আ. হালিম মাদানী*

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبيه أجمعين.

তাওহীদ সহমত ‘ইবাদত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার উপর ফর্‌য করেছেন তাক্বওয়া অর্জনের জন্যেই। তাই সে সম্পর্কে জানা আবশ্যক, বিধায় এ প্রবন্ধটি লিখলাম।

তাক্বওয়ার আভিধানিক অর্থ : তাক্বওয়া অর্থ হচ্ছে– বেঁচে থাকা বা সুরক্ষিত রাখা। এর মাসদার হচ্ছে– الوقاء, অর্থাৎ- কোনো জিনিসকে কষ্টকর ও ক্ষতিকর বস্তু হতে রক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾

“এবং তাদের রব তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে।”[৪৮]

আর কাউকে اتق الله অর্থাৎ- “তুমি মহান আল্লাহকে ভয় করো” এই কথা বলার মর্ম হলো– ‘তুমি তোমার মাঝে এবং মহান আল্লাহর মাঝে রক্ষাকবচ গ্রহণ করো’ হাদীসে রাসূল (ﷺ) এই অর্থেই বলেছেন : ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো এক টুকরো খেঁজুরের বিনিময়ে হলেও।[৪৯]

পারিভাষিক অর্থ : তাক্বওয়ার প্রায় দশটিরও বেশি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে, যেখানে তাক্বওয়ার বিভিন্ন অংশগুলোর একে একে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

তবে এগুলোর মাঝে সর্বোত্তম সুন্দর অর্থ পাওয়া যায় তালক্ব ইবনু হাবিব (রহিমাহুল্লাহ-র)’র দেওয়া সংজ্ঞার মধ্যে, যেখানে তিনি বলেছেন : ‘দুনিয়াতে যখন ফিতনাহর ছড়াছড়ি হবে, তোমরা সেটাকে তখন তাক্বওয়ার মাধ্যমে নির্মূল করে দাও।’

লোকেরা বললো : হে সম্মানিত ইমাম! তাক্বওয়া কী? উত্তরে তিনি বললেন, তাক্বওয়া হলো মহান আল্লাহর রহমতের আশায় তাঁর আনুগত্য করে যাওয়া এবং তাঁর ‘আযাবের ভয়ে সকল পাপ কাজ বর্জন করা।

ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ বর্ণনা করেছেন।

‘আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র সংজ্ঞা : তাক্বওয়া হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, কুরআন অনুযায়ী ‘আমল করা, অল্পতে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যু দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সংজ্ঞা হচ্ছে– তাক্বওয়া হলো সর্বদা রবের আনুগত্য করতে হবে, তাঁর নাফরমানি করা যাবে না, রবের স্মরণ করতে হবে, তাঁকে ভুলে যাওয়া যাবে না এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে কোনো অবস্থাতেই তাঁর না-শুকরি করা যাবে না।

‘উমার ইবনু ‘আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ-র) তাক্বওয়ার পরিচয়ে বলেন– তাক্বওয়া হলো আল্লাহ তা‘আলা যা হারাম করেছেন তা ছেড়ে দেওয়া এবং তিনি যা ফর্‌য করেছেন তা আদায় করা।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ-র)’র একটি সংজ্ঞা রয়েছে, তা এই যে, তাক্বওয়া বলতে সার্বিকভাবে যা বুঝায় তা হলো– আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং মন্দ কাজ ছেড়ে দেওয়া।

ইবনু রজব আল-হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, তাক্বওয়ার ভিত্তি হচ্ছে বান্দা মহান আল্লাহর শাস্তি, ক্রোধ এবং রাগের কথা ভেবে তার এবং রবের মাঝে একটি সুরক্ষাপ্রাচীর তৈরি করবে, আর সেই সুরক্ষাপ্রাচীর হচ্ছে তাঁর আনুগত্যের কাজ করা এবং তাঁর নাফরমানি থেকে বিরত থাকা।

তাক্বওয়ার আরও কিছু বিশেষ পরিচয় রয়েছে। সেগুলোর অন্যতম হলো–

ইমাম সুয়ুতী (রহিমাহুল্লাহ-র) তার ‘আদ দুর্‌রুল মানসূর’ কিতাবে বর্ণনা করেন, একবার এক লোক আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথে হেটেছো? সে হ্যাঁ বলল। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যখন হেঁটেছিলে কীভাবে হেঁটেছিলে? সে বলল হাঁটার সময় আমি কাঁটা দেখলে অতিক্রম করে যেতাম কিংবা সরে পড়তাম। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাক্বওয়াও ঠিক এরকমই। অনুরূপ বর্ণনা ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ-র)’র লিখিত শরহুস-সুন্নাহ কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে, ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয (রহিমাহুল্লাহ-র) একদা বললেন, মুত্তাকী ব্যক্তি হচ্ছে লাগাম পরিহিত, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না।

---

* *বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৪৮] *সূরা আত্ তূর : ১৮।*

[৪৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

তাক্বওয়ার আলামত : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাক্বওয়ার নিদর্শন হচ্ছে তুমি নিজেকে কখনোই অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করবে না।

হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাক্বওয়াশীল বা মুত্তাকী ব্যক্তিদের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে তাদের সহজেই চেনা যায়– কথা বলার সময় সত্য বলে, ওয়াদা দিলে পূর্ণ করে, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে, দুর্বলদের উপর সদয় থাকে, গর্বমুক্ত ও নিরহংকার থাকে, সৎ পথে ব্যয় করে এবং সদা কোমল আচরণকারী ও উত্তম আচরণকারী হয়ে থাকে।

আবূ নুয়াইম আল হিলয়াতে এটি বর্ণনা করেছেন।

তাক্বওয়ার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য :

১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হচ্ছে কালিমাতুত তাক্বওয়া বা তাক্বওয়ার কালিমা : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا۟ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾

"যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করলেন; আর তাদেরকে তাক্বওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।"[৫০]

২. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এই কালেমার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আদেশ করেছেন এবং মু'মিনদের আদেশ করেছেন খাসভাবে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

"হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করো এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর নজরদারি রাখেন।"[৫১]

তিনি আরো বলেন–

﴿وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾

"আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।"[৫২]

৩. তাক্বওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীই তাঁদের নিজ জাতিকে আদেশ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

"যখন ওদের ভাই নূহ্ ওদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না?"[৫৩]

তিনি আরো বলেন–

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

"যখন ওদের ভাই হূদ ওদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না?"[৫৪]

৪. আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রত্যাদেশ করেছেন তাক্বওয়া বাস্তবায়ন করতে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার (ধর্মভীরু) হতে পার।"[৫৫]

---

[৫০] *সূরা ফাতহ : ২৬।*

[৫১] *সূরা আন্ নিসা : ১।*

[৫২] *সূরা আন্ নিসা : ১৩১।*

[৫৩] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ১০৬।*

[৫৪] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ১২৪।*

[৫৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১।*

তাক্বওয়ার ফল

১. মহান আল্লাহর ভালোবাসা : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾

"তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিনদের ভালোবাসেন।"[৫৬]

২. দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর রহমত : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ করো, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা ভয় করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।"[৫৭]

৩. তাক্বওয়া মহান আল্লাহর সাহায্য আসার কারণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[৫৮]

৪. যে মহান আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল প্রকার অনিষ্ট ও ভয়ভীতি থেকে রক্ষা করবেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"হে মানবজাতি! যখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো রাসূল তোমাদের নিকট এসে আমার নিদর্শনসমূহ বিবৃত করে, তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৫৯]

৫. তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির অন্তরে নূর ঢেলে দেয়া হবে, ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।"[৬০]

৬. তাক্বওয়ার সাহায্যে বান্দা এমন শক্তি লাভ করে যার মাধ্যমে সে শয়তানকে পরাস্ত করতে পারে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা তাক্বওয়াবান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।"[৬১]

৭. তাক্বওয়া বিরাট সফলতার উপায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا﴾

"এটা আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহকে যে ভয় করবে, তিনি তার পাপরাশি মোচন করবেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার।"[৬২]

---

[৫৬] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৪।*
[৫৭] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৬।*
[৫৮] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৮।*
[৫৯] *সূরা আল আ'রাফ : ৩৫।*
[৬০] *সূরা আল আনফাল : ২৯।*
[৬১] *সূরা আল আ'রাফ : ২০১।*
[৬২] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৫।*

৮. তাক্বওয়ার মাধ্যমে রিযক প্রশস্ত হয় এবং নানান প্রকার কল্যাণের দ্বার উন্মোচন হয়ে যায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾

"আর যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করত ও তাক্বওয়াবান হত, তাহলে তাদের জন্য আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা মনে করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।"[৬৩]

৯. দুশ্চিন্তা দূর হয় তাক্বওয়ার মাধ্যমে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾

"আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। অর্থাৎ- যাবতীয় কঠিন সমস্যা ও পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বের করে দেবেন।"[৬৪]

১০. তাক্বওয়া অবলম্বন করলে শত্রুর বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসে এবং তাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

"যদি তোমাদের কোনো মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাক্বওয়াবান হয়ে চলো, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে, নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে।"[৬৫]

১১. দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি একমাত্র মুত্তাকিনদের জন্য : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ﴾

"সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এইরূপ : ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী; যারা তাক্বওয়া অবলম্বনকারী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম হলো জাহান্নাম।"[৬৬]

১২. মুত্তাকিরাই শুধু ওয়াজ শুনলে উপকৃত হয় এবং মহান আল্লাহর কিতাবের আয়াত নিয়ে তারাই চিন্তা করে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

"এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর ধর্মভীরুদের জন্য পথের দিশারী ও উপদেশ।"[৬৭]

১৩. তাক্বওয়া হলো মহান আল্লাহর রাস্তায় চলার পথে উত্তম পাথেয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

"আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ করো এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় করো।"[৬৮]

১৪. তাক্বওয়া হলো 'আমল কবুলের অন্যতম উপকরণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ ۗ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾

"আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও ক্বাবীলের) ঘটনা তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হলো না। (তাদের একজন) বলল, 'আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব।' (অপরজন) বলল, 'আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।"[৬৯]

১৫. কুরআন মুত্তাকিদের সুসংবাদ দেয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا﴾

---

[৬৩] *সূরা আল আ'রাফ : ৯৬।*
[৬৪] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২।*
[৬৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১২০।*
[৬৬] *সূরা আর্ রা'দ : ৩৫।*
[৬৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৮।*
[৬৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৭।*
[৬৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭।*

"আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি; যাতে তুমি তার দ্বারা তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।"[৭০]

১৬. কিয়ামতের দিন সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে একমাত্র মুত্তাকিদের সম্পর্ক ছাড়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾

"বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।"[৭১]

১৭. মুত্তাকিরাই একমাত্র সফলকাম : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হলো কৃতকার্য।"[৭২]

১৮. মুত্তাকিদের মহান আল্লাহর রহমত বেষ্টন করে রাখে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"সুতরাং আমি রহমত তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা আমাকে ভয় করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।"[৭৩]

১৯. তাক্বওয়া পাপ-মোচনের অন্যতম উপায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো; তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭৪]

২০. সম্মান শুধু তাক্বওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।"[৭৫]

২১. কিয়ামতের দিন তাক্বওয়ার মাধ্যমে বান্দা মুক্তি পাবে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

"পরে আমি মুত্তাকিদের উদ্ধার করব এবং সীমালংঘনকারীদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় বর্জন করব।"[৭৬]

২২. তাক্বওয়ার একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"জান্নাত মুত্তাকিদের নিকটবর্তী করা হবে।"[৭৭]

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাকেসহ তাঁর সকল বান্দাকে তাক্বওয়া অবলম্বন করার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন। ❑

---

[৭০] *সূরা মারইয়াম : ৯৭।*
[৭১] *সূরা আয্ যুখরুফ : ৬৭।*
[৭২] *সূরা আন্ নূর : ৫২।*
[৭৩] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৬।*
[৭৪] *সূরা আল হাদীদ : ২৮।*
[৭৫] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৩।*
[৭৬] *সূরা মারইয়াম : ৭২।*
[৭৭] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ৯০।*

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[তৃতীয় পর্ব]

দারুন নাদওয়ায় যাদের প্রবেশাধিকার ছিল তাদেরকে বলা হতো মালা (الملأ)। তারাই মূলত মক্কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদী পরামর্শভিত্তিক সম্পন্ন করতেন। এজন্য তারা লিখিত কোনো সংবিধানের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন না। যখন যা প্রয়োজন হতো তখন পরামর্শ সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত নিতেন। আল কুরআন সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলছে,

"কাফিররা বলে, আর আমরা তাদের রেখে যাওয়া আচার, রীতি-নীতিকেই অনুসরণকারী।"[৭৮]

উল্লেখ্য, মালা পরিষদ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যে নিয়ম-রীতি প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিত সকলের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত ছাড়া কখনোই কার্যকর হতো না। (অর্থাৎ- কোনো স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ছিল না)। আল ফাসী (মৃ. ৮৩২ হি.) সেদিকে ইশারা করে বলেন, তাদের (মালা) কেউ কুরাইশের উপর একচ্ছত্র প্রভাব খাটাতে পারত না; বরং কুরাইশ সাধারণ জনগণ মেনে নিলে তবেই তা কার্যকর হতো।[৭৯]

কখনো কখনো গোত্রের সাধারণ জনগণ ঐ সকল মালাদের চেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখত। বিশেষত ঐ সকল বিষয়ে যেগুলো কেবল মক্কার সাথেই বিশিষ্ট ছিল না।[৮০]

মূলত মক্কাবাসী কখনোই কোনো রাজতন্ত্রকে মেনে নেয়নি। তারা কারো মাথায় শাসন কর্তৃত্বের মুকুট পড়াইনি। আর না তাদের কোনো একক শাসক ছিল। যদিও মালা পরিষদের একজন প্রধান ছিলেন, কিন্তু পরিষদের পরামর্শের বাইরে তিনি একাকী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। মক্কার সেই মালা পরিষদের সাথে গ্রিকদের একেশিয়া পার্লামেন্টের অনেকখানিই মিল ছিল।[৮১]

মক্কায় প্রশাসনিক চর্চার বেশ অগ্রগতিও হয়েছিল। পরামর্শ ব্যতিরেকে কেউ কোনো কাজ করত না। 'পরামর্শ প্রদান' একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছিল। বানু আসাদ এই কাজ আঞ্জাম দিত সুচারুরূপে। কারণ মক্কাবাসী কোনো কিছু করতে চাইলে ইয়াযিদ বিন যামআর (মৃ. ৮ হি.) নিকট উপস্থিত হয়ে পরামর্শ চাইত। তিনি যদি তাদের সাথে একমত হতেন তাহলে তাদেরকে তা বুঝিয়ে দিতেন এবং সেই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্বও দিয়ে দিতেন। আর না হলে নিজেই একটি কাজ বাছাই করে সম্পন্ন করতেন। তখন অন্যরা তাকে সাহায্য করত।[৮২]

তবে মক্কার এমন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বাইরে গিয়ে নিজেকে একচ্ছত্র রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও ঘোষণা দেয়ার চেষ্টা যে কেউ করেনি তা কিন্তু নয়। 'উসমান ইবনু হুরাইস একবার রোমের সম্রাটের নিকট গিয়ে তাকে মক্কার গভর্নর করার আবেদন করে। বিনিময়ে তিনি কুরাইশকে রোমদের বশীভূত করবেন। আর রোমানরা 'উসমানের মধ্যে সেই যোগ্যতা দেখতেও পায় যে, এই লোক মক্কাসহ আরব উপদ্বীপকে তাদের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম। তাই তারা তাকে মক্কার দায়িত্ব দিয়ে আবেদন মঞ্জুর করে। কিন্তু মক্কাবাসী তা মেনে নেয়নি; বরং মক্কায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গোপনে তাকে হত্যা করা হয়।[৮৩]

মক্কার ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা বলতে ছিল কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও হজ্জের যাবতীয় দায়িত্ব পালন। কুসাইয়ের মৃত্যুর পর সেগুলো কুরাইশের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা গোত্রে বন্টন করে দেয়া হয়।[৮৪]

এসব দায়িত্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল রিফাদা বা হাজীদের মেহমানদারি করা। কুসাই কুরাইশের উপরে আবশ্যক করে দিয়েছিল যে, তারা তাদের সম্পদের নির্দিষ্ট একটা অংশ তার কাছে প্রদান করবে যেন তিনি তা দিয়ে মিনা ও আরাফার দিনে হজ্জ পালন করতে আসা হাজীদেরকে মেহমানদারি করাতে পারেন। কারণ তিনি হাজীদেরকে আল্লাহর মেহমান মনে করতেন। ইবনু ইসহাকের (মৃ ১৫১ হি.) বর্ণনামতে, তিনি কুরাইশকে একত্রিত করে বললেন, "ওহে কুরাইশ! নিশ্চয় তোমরা হলে আল্লাহর প্রতিবেশী, তার গৃহের সেবক এবং হারামে বসবাসকারী। আর হাজী সাহেবগণ আল্লাহর মেহমান এবং

---

* *শিক্ষক : মাদরাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৭৮] *সূরা আয্ যুখরুফ : ২৩।*

[৭৯] *শিফাউল গরাম- আল ফাসী, ২/১০৮; আল মুফাসসাল- জাওয়াদ আলী, ৪/৪৮, ৪৯।*

[৮০] *আল মুফাস্সাল- ৪/৪৮।*

[৮১] *আল মুফাসসাল- ৪/৪৭।*

[৮২] *আল ইকদুল ফারীদ- ইবনু আব্দি রব্বিহি, ৩/২৩৬; বুলূগুল আরব- ১/২৪৯।*

[৮৩] *আখবারে মক্কা- ১/১৪৪; শিফাউল গরাম- ২/১০৮।*

[৮৪] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১৩০।*

আল্লাহর গৃহ যিয়ারতকারী। কাজেই তারা সম্মান ও মেহমানদারি পাওয়ার উপযুক্ত। হজ্জের দিনগুলোতে তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করো।" এর ফলে তারা মেহমানদারির ব্যবস্থা করল।[৮৫]

এই ব্যবস্থাপনায় কুসাইয়ের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এর ফলে মানুষ মক্কায় হজ্জ করতে পূর্বের তুলনায় অরো বেশি করে আগমন করে। এবং সকলের নিকটে বিশেষ করে বেদুঈন গোত্রগুলোর নিকটে কুরাইশের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুসাইও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাদেরই এক কবি বলেন,

তিনি হলেন হাজীদের পিতা, তিনি তাদেরকে চর্বি পরিবেশন করেন

কুসাইয়ের পনির মিশ্রিত গোসত তাদেরকে পরিতৃপ্ত করে এবং দুধের সাথে টুকরো টুকরো রুটি।[৮৬]

ইতিহাসের উৎসগুলো হাশিমেরও অনেক প্রশংসা করেছে। কারণ তার আমলে এই কাজটি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে।[৮৭] তিনি হাজীদেরকে রুটি ও সারিদ (পায়েশ জাতীয় এক প্রকার উন্নত মিষ্টান্ন) পরিবেশন করে খাওয়াতেন। কবি তার প্রশংসা করে বলেন,

আমর, যে তার কওমের জন্য সারিদ প্রস্তুত করে খাওয়ায় যে সময় মক্কার লোকেরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত থাকে।

দুই সময়ে তারা দুর্ভিক্ষে কাটায়, শীত ও গ্রীষ্মের সফরে যখন কাফেলাগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্য বাইরে থাকে।[৮৮]

রিফাদা বা হাজীদের মেহমানদারির ব্যবস্থাপনা সাধারণত কুরাইশের ধনাঢ্য লোকেরাই করত। কারণ এতে অনেক অর্থ-কড়ির প্রয়োজন ছিল। হাশিমের পর তার ছেলে মুত্তালিব অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ ভালোভাবে এই দায়িত্বের আঞ্জাম দেন এবং সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। এরপর তার বংশের লোকেরাই এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে থাকে। যেমন তার পরে তার সন্তান আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (মৃ.৩২ হি.) এই দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী যুগেও নবী (ﷺ) তাকে এই দায়িত্বে বহাল রাখেন।[৮৯]

তেমনি মক্কায় পানির অভাবে লোকেরা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করত। হাশিম মক্কাবাসীর জন্য পানির কূপ খনন করেন। ইতোপূর্বে কুসাইও একটি কূপ খনন করেছিলেন। এতে মক্কাবাসীর পানির কষ্ট লাঘব হয়। এভাবে পানির ব্যবস্থা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে ওঠে। যেহেতু মক্কা ছিল শুষ্ক অঞ্চল যেখানে পানির কষ্ট ছিল অবর্ণনীয়।[৯০]

যমযম কূপ অব্যবহৃত হওয়ার দরুন মক্কায় পানির সুব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য কাবা চত্বরে চামড়ার একটি বিশাল পাত্রে বিভিন্ন কূপ ও নালা থেকে পানি জমা করে বন্টন করা হয়। মাঝে মাঝে পানির লবণাক্ততা কাটানোর জন্য খেজুর ও আঙুর মেশানো হতো।[৯১]

হাশিম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আগত হাজীদেরকে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করে গেছেন।[৯২] তার পরবর্তীতে তার বংশধরের মাঝেই এই দায়িত্ব পালিত হতে থাকে। যেমন আব্দুল মুত্তালিব হাজীদেরকে মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করতেন।[৯৩] এরপর তিনিই যমযম কূপ খনন করেন।[৯৪] তিনি পানিতে কিশমিশ মিশিয়েও পান করাতেন।[৯৫]

কতিপয় বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাজীদেরকে পানি পান করানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজে মক্কার তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাঝে প্রতিযোগিতা ছিল।[৯৬]

বলা হয়, সুআইদ বিন হারামি সর্বপ্রথম হাজীদেরকে দুধ পান করান।[৯৭]

তেমনি আবূ 'উমাইয়াহ্ ইবনু মুগীরাহ্ সাধ্যমতো আরোহীদের পাথেয় প্রদান করতেন এবং আবূ ওদাআ আস সাহমী হাজীদেরকে মধু পান করাতেন।[৯৮]

মোটকথা, হাজীদের সেবা করার বিষয়টি কুরাইশের নিকটে গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা সেদিকে ইশারা করে বলেন,

---

[৮৫] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১৩০।*

[৮৬] *বালাযুরি, আল আনসাব, ১/৫১।*

[৮৭] *সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৩৫, ১৩৬, ১৪৭।*

[৮৮] *কবি আব্দুল্লাহ বিন যাবআরী, সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৩৬।*

[৮৯] *সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৩৫, ১৩৬, ১৪৭, তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/৮১-৮৩।*

[৯০] *তবাকাতে ইবনে সাদ, ১/৭৮, আখবারে মক্কা, ১/৭৯।*

[৯১] *আখবারে মক্কা. ১/৬৬, নিহায়াতুল আরব, ১৬/৩৫।*

[৯২] *তবাকাতে ইবনে সাদ- ১/৭৮।*

[৯৩] *মাসউদি, মুরুযুয যাহাব, ৩/১০৩।*

[৯৪] *মাসউদি, মুরুযুয যাহাব, ২/১০৩।*

[৯৫] *আখবারে মক্কা, ১/৭০।*

[৯৬] *নাসাবু কুরাইশ- যাবীদি, পৃ. ৩৬, ১৯৭, ১৯৮।*

[৯৭] *নাসাবু কুরাইশ- পৃ. ৩৪২।*

[৯৮] *আল মুহাব্বার- ইবনু হাবীব, পৃ. ১৭৭।*

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন না।”[৯৯]

কাজেই বুঝা যায় যে, পানি পান করানোর বিষয়টি একক কোনো বিষয় ছিল না; বরং এটি তখনকার মক্কার একটি জাতীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছিল।

অপরদিকে সিদানা (السدانة) বা হিযাবা (الحجابة) অর্থাৎ- কাবা ঘরের দেখভাল ও আগুন্তক মেহমানদের খিদমত করাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিশেষত পুরো আরবে কাবা ছিল সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। এই দায়িত্ব পালন করত ‘উসমান ইবনু আব্দুদ দারের বংশ। এরপর দায়িত্বে আসে আব্দুল ওযযা ইবনু ‘উসমান। অতঃপর আবূ তালহাহ্ (‘আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল ওযযা)। তারপর তার সন্তান ‘উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (মৃ. ৪২ হি.) দায়িত্ব পালন করেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (ﷺ) তাকে স্বপদে বহাল রাখেন।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত এই দায়িত্ব (কাবা ঘরের চাবি সংরক্ষণ) ‘উসমানের বংশেই রয়ে গেছে। কারণ নবী (ﷺ) বলেন,

خذوها يا آل عثمان خالدة تالدة لا ينزعه منكم إلا ظالم.

“হে ‘উসমানের বংশ! তোমরা এটাকে চিরতরের জন্য গ্রহণ করো। যালিম ব্যতিরেকে কেউ তোমাদের থেকে এই দায়িত্ব ছিনিয়ে নিবে না।”[১০০]

তেমনি ইমারাহ (العمارة) বা কাবা ঘর সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ ইত্যাদির দায়িত্ব কুরাইশের গর্বের বস্তু ছিল। কুরআন বলছে–

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন না।”[১০১]

এই দায়িত্ব পালন করতেন ‘আব্বাস (মৃ. ৩২ হি.) ও শাইবাহ্ ইবনু ‘উসমান। এই দায়িত্বের অন্যতম কাজ ছিল হারামগৃহে কেউ যেন খারাপ কথা উচ্চারণ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।[১০২]

এছাড়াও আরো বেশ কিছু দ্বীনি প্রশাসনিক দায়িত্ব কার্যকর ছিল। তবে সেগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেমন- হজ্জের সময় মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার দায়িত্ব ছিল আদওয়ান গোত্রের কাছে। তাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি রওয়ানা দেয়ার আগ পর্যন্ত কেউ রওয়ানা দিতে পারত না। এই দায়িত্ব বংশ পরম্পরায় লাভ কার্যকর ছিল। তাদের সর্বশেষ দায়িত্বশীল আবূ সাইয়ারাহ উমাইলা বিন আ'যাল ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।[১০৩]

ঐ সকল সম্পদ যেগুলো তারা তাদের দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গ করত, যেগুলোকে বলা হতো الأموال المحجرة। সেগুলোর দায়িত্ব ছিল সাহম গোত্রের। সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের গোত্রের হারেস বিন কাইস।[১০৪]

জুমাহ গোত্রের সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ্ (মৃ. ৪১ হি.) (الأزلام) বা শর নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করতেন। হুবাল মূর্তির কাছে শর/তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করা হতো।[১০৫]

মোটকথা, এগুলো ছিল অর্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। তারা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে মাল-সম্পদ উৎসর্গ করত। ইসলাম এসবকে বাতিল ঘোষণা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারির তীর, এ সব গর্হিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া

[৯৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১৯।*
[১০০] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ২/৪১২।*
[১০১] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১৯।*
[১০২] *তাফসীরে তবারি- ১৪/১৭২; আল ইসাবা- ইবনু হাজার, ২/২৭১; আল ইকদুল ফারীদ- ইবনু আব্দি রব্বিহি, ৩/২৩৬।*
[১০৩] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১২০, ১২১, আস্ সিরাহ আন নবাবিয়্যাহ- ইবনু কাসীর, ১/৯৫।*
[১০৪] *আল ইকদুল ফারীদ- ৩/২৩৬; বলুগুল আরব- আলুসী, ১/২৪৯।*
[১০৫] *ঐ- ৩/২৬।*

আর কিছুই নয়। সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়।"[১০৬]

صوفة -সুফা হলো মিনায় হজ্জের সময় পাথর নিক্ষেপের সর্বশেষ দিনের অনুমতি প্রসঙ্গ। অর্থাৎ- যেদিন হাজ্বীরা বিদায় গ্রহণ করবে সেদিন পাথর নিক্ষেপের জন্য দায়িত্বশীলের অনুমতি নিতে হতো। এই দায়িত্ব পালন করত বানু জুরহুম। কুসাই বিন কিলাব তাদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং নিজেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে কিছু বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষ পর্যন্ত বানু জুরহুমই এই দায়িত্ব পালন করেছিল।[১০৭]

প্রশাসনিক এ সকল দায়িত্ব কুরাইশ এবং তার শাখা-প্রশাখা গোত্রগুলোর মাঝে বন্টিত হওয়ার পরে উল্লিখিত দায়িত্বটি তামীম গোত্রের ভাগে পড়ে। যেমনটি ইবনু হাযম (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন।[১০৮]

আরেকটি দুর্বল দায়িত্ব ছিল নাসী (النسيء)। এই কাজে আঞ্জাম দিতেন বানু কিনানা। তারা মাস গণনা করত। তাদের পরে দায়িত্ব পায় বানু সা'লাবা ইবনু হারেস ইবনু মালেক। তাদেরকে বলা হতো কলামিসা (القلامسة)। দায়িত্বশীলকে বলা হতো কলমিস (القلمس)। তিনি আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে লোকদের পরামর্শ নিতেন। তারা তাকে পরামর্শ দিতো মুহার্‌রম মাসকে পিছিয়ে দিতে। তিনি তাই করতেন।[১০৯]

কুরআন বলছে, মাসকে পিছিয়ে দেওয়া হলো কুফ্‌রী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই এই (মাসগুলোর) স্থানান্তর কুফ্‌রের মধ্যে আরও কুফ্‌রী বৃদ্ধি করা, যদ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। (তা এ রূপে যে) তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, আল্লাহ যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের কাছে শোভনীয় মনে হয়, আর আল্লাহ এইরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক্ব দান) করেন না।"[১১০]

মক্কায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারও অনেক বেশি গুরুত্ব ও ভূমিকা ছিল। বলা যেতে পারে, ধর্মীয় প্রশাসনের অধিকাংশ বিষয়ই মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আমরা জানি, মক্কা একটি অনুর্বর ফল-ফসলহীন অঞ্চলে অবস্থিত।, ফলে সেখানের বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধানতম মাধ্যম ছিল ব্যবসা। কুরাইশ ছিল ব্যবসায়ী গোত্র। তবে তারা মক্কার বাইরে বাণিজ্য করত না। ব্যবসায়ীগণ মক্কায় তাদের পণ্য-দ্রব্যাদি নিয়ে এসে বেচা-কেনা করতেন।[১১১]

সর্বপ্রথম হাশিম ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন করেন (শাম ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন)। তিনি শামে অনেক উদারতা ও ভালো আচরণের প্রকাশ ঘটান। এমনকি রোম সম্রাট তাকে নিজের কাছে টেনে নেন। হাশিম সেই সুযোগে নিজের জন্য একটি বাণিজ্যিক নিরাপত্তা চুক্তি লিখে নেন, যেখানে তিনি মক্কায় নির্বিঘ্নে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করেন। তেমনি তিনি সেখানের স্থানীয় ধনাঢ্য, নেতৃস্থানীয় ও কবীলা প্রধানদের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি করেন।[১১২]

বিভিন্ন উৎসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, إيلاف - বাণিজ্যিক চুক্তি প্রথম গ্রহণ করেন হাশিম।

ইবনু সা'দ إيلاف-কে চুক্তি বা حلف বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাবীব إيلاف শব্দই ব্যবহার করেছেন। বালাযুরী (মৃ. ২৭৯) عصام শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবারি (মৃ. ৩১০ হি.) عصام ও جعل দুই শব্দই ব্যবহার করেছেন। আল কালী (মৃ. ৩৫৬ হি.) عهد শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১১৩]

অতঃপর মুত্তালিব ইয়ামান থেকে, আবদে শামস হাবশা থেকে এবং নাওফাল ইরাক থেকে বাণিজ্যিক চুক্তি নিয়ে আসেন।[১১৪]

এভাবেই মক্কাবাসী আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের বাণিজ্যকে পরিচিত করে তোলে।

লক্ষণীয় যে, হাশিম তার লভ্যাংশে অন্যান্য গোত্রগুলোর জন্যও অংশ রাখতেন। তাদেরকেও মক্কার বাণিজ্যে শরীক

---

[১০৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৯০।*

[১০৭] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১১৯; তারিখে তবারি- ২/২৫৭; আস সিরাহ আস নাবাবিয়্যাহ- ইবনু কাসীর, ১/৯৫।*

[১০৮] *জামহারাহ- ইবনু হাযম, পৃ. ১২, ৩০৩।*

[১০৯] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৬; ইবনু হাবীব; আল মুহাব্বার- পৃ. ১৫৬, ১৫৭; আল মুনাম্মাক- পৃ. ২৭৩; তারিখে তবারি- পৃ. ২৮০।*

[১১০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৭।*

[১১১] *যাইলুল আমালী- আল কালী, পৃ. ২০১।*

[১১২] *আল মুনাম্মাক- ইবনু হাবীব, পৃ. ৩১-৪০; তারিখে তবারি- ২/২৫২।*

[১১৩] *দেখুন : তবাকাতে ইবনু সা'দ, ১/৭৫-৮০।*

[১১৪] *আল মুনাম্মাক- ৩১-৪০ পৃ.।*

করাতেন। জাহেয (মৃ. ২৫৫ হি.) বলেন, তিনি তার ব্যবসায় মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে শরীক করাতেন এবং তাদেরকে লভ্যাংশ দিতেন। অর্থাৎ- যে মক্কায় থাকত সে পেত লভ্যাংশ, আর যে ব্যবসায়ী কাফেলায় যেত সে পুরো অংশ পেত।[১১৫]

কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হাশিম ধনী-গরিব সবাইকে সুযোগ দিতেন। গরীবরাও ধনীদের সাথে ব্যবসায় শরীক হতে পারত। সকল মক্কাবাসী এতে অংশ নিত। যেমনটি কবি মাতরুদ বিন কাবের কবিতায় ফুটে উঠেছে–

والخالطين فقيرهم غنيهم * حتى يكون فقيرهم كالكافي.

আর তাদের ধনীদের সাথে গরিবরাও অংশগ্রহণকারী ছিল। এমনটি গরিব ব্যক্তিও ধনীর মতো হয়ে যেত।[১১৬]

মক্কার বাইরে থেকে আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণভাবে মক্কায় সর্বসাধারণকে ব্যবসায় শামিল করার দারুণ একটি প্রক্রিয়া; যা হাশিম তার যোগ্য নেতৃত্বে পরিচালনা করছিল, তা মক্কার বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মক্কা ও কুরাইশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মক্কার ভৌগলিক অবস্থার কারণে (যেহেতু তা আরব গোত্রগুলোর মধ্যভাগে অবস্থিত) এবং শক্তিশালী বাণিজ্য পরিচালনা করায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে মক্কা নগরী ঐ অঞ্চলের প্রধানতম বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রগুলো মক্কায় এসে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করত। (পাইকারীভাবে ক্রয় করে নিজ গোত্রের বাজারে বিক্রি করত) মক্কা নগরীর প্রশাসন আগত ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান করেছিল। কেউ যেন যুলুম-দুর্নীতি করতে না পারে সেদিকে প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং এ লক্ষ্যেই 'হিলফুল ফুযুল' গঠিত হয়। যেখানে কুরাইশের পাঁচটি উপশাখা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা প্রত্যেক মাযলুমকে তার ন্যায্য পাওয়া বুঝে দিতে সচেষ্ট থাকবে। নবী (ﷺ) বলেন,

شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِيْنَ مَعَ عُمُوْمَتِيْ وَأَنَا غُلَامٌ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّيْ أَنْكُثُهُ.

আমি আমার চাচাদের সাথে মুত্তায়িবীনদের কৃত সন্ধিতে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন ছিলাম ছোট। আমি কখনোই পছন্দ করব না যে, আমাকে একটা লাল উট দেয়া হোক আর আমি এটা ভেঙ্গে ফেলি।[১১৭]

প্রকাশ থাকে যে, মক্কার বাজারে কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ার পর উল্লিখিত চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এও উল্লেখ্য, বাজার ব্যবস্থাপনা ছিল খুব উন্নত, সুচারুরূপে তা পরিচালিত হতো। প্রত্যেক বাজারের জন্যই বাজার পরিচালনা কমিটি ছিল। তারাই এসব দেখভাল করতেন। এমনকি অস্ত্রধারী দায়িত্বশীলও থাকত যিনি সকল যুলুম-দুর্নীতি রোধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতেন।[১১৮]

ইয়াকুবি (মৃ. ২৯২ হি.) সেদিকে ইশারা করে বলেন, আরবের কিছু গোত্র ছিল যারা বাজারে এসে যুলুম করা হালাল মনে করত। তাদেরকে বলা হত المحلين -মুহিল্লীন বা হালালকারী। আবার তাদের প্রতিরোধ করে মাযলুমকে সহযোগিতা করার মতো কতিপয় উন্নত গুণের লোকও ছিল। তাদেরকে الزادة المحرمين -যাদাতুল মুহরিমান বা ইহরামকারীদের নিরাপত্তা দানকারী বলা হতো।[১১৯]

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ প্রমাণ করে যে, মক্কার বাজারসমূহ ছিল অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালিত। প্রত্যেকটি বাজারের সুনির্দিষ্ট তারিখ ছিল। নির্ধারিত সেই তারিখেই বাজার বসত এবং নির্ধারিত তারিখেই তা শেষ হতো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন ইবনু হাবীব (মৃ. ২৪৫ হি.) *আল মুহাব্বার*, ইয়াকুবি (মৃ. ২৯২ হি.) *তারিখে ইয়াকুবি* এবং কালকাশান্দি (মৃ. ৮২১ হি.) তার *ছুবহুল আ'লা* নামক গ্রন্থে।[১২০]

মক্কায় আরেকটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছিল। তা হলো হুমুস (الحمس)। এই ব্যবস্থাপনা ছিল কেবল অকুরাইশদের জন্য। ইলাফ (إيلاف) এবং হুমুসের (حمس) মাঝে পার্থক্য হলো, إيلاف -ইলাফ ছিল মক্কার বাইরে বিভিন্ন গোত্র ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি। হুমুস ছিল হজ্জের মৌসুমে কেবল মক্কার অভ্যন্তরীণ গোত্রগুলোর মাঝে সম্পাদিত চুক্তি। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[১১৫] *রাসায়েল- আল জাহেয, পৃ. ৭০-৭১।*

[১১৬] *আনসাব- রালায়ুরি, ১/৫৭; তারিখ- ইয়াকুবি, ১/২৪১, ২৪২।*

[১১৭] *মুসনাদে আহমাদ- ১/১৯০, মা. শা., হা. ১৬৫৫; সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১২২; তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/১২৬-১২৮।*

[১১৮] *আল মুফাস্‌সাল- জাওয়াদ আলী, ৭/৩৬৯।*

[১১৯] *তারিখে ইয়াকুবি- ১/২৭১।*

[১২০] *আল মুহাব্বার- পৃ. ২৬৩-২৬৮; তারিখে ইয়াকুবি- ১/২৩৬ এবং ছুবহুল আ'লা- ১/৪১।*

সাহাবা চরিত

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ই বিশ্বের মুসলিম মহিলাদের আদর্শের প্রতীক

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

হিজরতের পূর্বে মক্কায় রাসূল (ﷺ)-এর পরিবার বলতে ছিল রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সঙ্গে বিয়ের সময় রাসূল (ﷺ)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং বিবি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বয়স ছিল চল্লিশ বছর। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ﷺ)-এর প্রথমা স্ত্রী। তাঁর জীবদ্দশায় নবী (ﷺ) অন্য কোনো বিয়ে করেননি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ইব্রাহীম ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন বিবি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র গর্ভজাত। পুত্রদের মধ্যে কেউই জীবিত ছিলেন না। তবে কন্যারা জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যয়নব, রোকায়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। যয়নবের বিয়ে হিজরতের পূর্বে তাঁর ফুফাতো ভাই আবুল আস ইবনু রবির সাথে হয়েছিল। রোকায়া এবং উম্মে কুলসুমের বিয়ে পর্যায়ক্রমে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে সম্পন্ন হয়। ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বিয়ে হয় বদর এবং উহুদের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে 'আলী ইবনু আবূ তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে। তাদের চার সন্তান হলেন হাসান, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যয়নব এবং উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলিম খাদীজাহ্ বিনতু খুয়াইলিদ। তিনি রাসূল (ﷺ)-কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। শুধু ভালোবাসতেন না, ছিল স্বামীর প্রতি অসীম বিশ্বাস। রাসূল (ﷺ) জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দেখে হেরা গুহা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যখন খাদীজাহ্'র কাছে ফিরে এসে যাবতীয় বৃত্তান্ত পেশ করলেন, তখন তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন–

কক্ষনো না। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দেন, মেহমানের খাতির করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।[১২১]

অতঃপর পতিপ্রাণা স্ত্রী খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দিয়ে মহানবী (ﷺ)-কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই অরাকা ইবনু নাওফালের নিকট যান। কারণ তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাওরাত-ইঞ্জীল তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে অরাকা বললেন, ইনি তো সেই ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল, যিনি মূসার নিকট অবতীর্ণ হতেন। হায়! যেদিন আপনাকে আপনার স্বজাতি দেশ থেকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত ও যুবক থাকতাম।

এ কথা শুনে মহানবী (ﷺ) বললেন : "তারা কি আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?" অরাকা বললেন, হ্যাঁ। আপনার মতো যে কেউই এ সত্য আনয়ন করেছেন তিনিই নির্যাতিত হয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবো। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই অরাকা মৃত্যুবরণ করেন।[১২২]

এভাবে স্ত্রী স্বামীর এই ভীতির সময় সহযোগিতা করেছিলেন। ইসলামের প্রভাতকালে তিনিই তাঁকে সাহস দিয়ে ছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন। ঈমান ও বিশ্বাস দিয়ে তাঁর মনকে সবল ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একমাত্র স্বামী মহানবী (ﷺ)-এর পাশে থেকে সকল প্রকার সুখ-দুঃখের সাথী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সেই উচ্চ নূর পর্বতের হেরা গুহাতে মহানবী (ﷺ) একাকীত্ব অবলম্বন করে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে মশগুল থাকতেন। সেখানে একমাত্র স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ই তাঁর খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিতেন কত কষ্ট করে। যেটি বর্তমানে হজ্জব্রত পালনকারী হাজীদের মাধ্যমে শুনলে রীতিমত অবাক হওয়ার কথা। অথচ এই সুউচ্চ হেরা গুহাতে একজন মহিলা হয়ে কত কষ্ট স্বীকার করে মহানবী (ﷺ)-এর খাদ্য পানীয় সরবরাহ করেছেন এটি নিঃসন্দেহে রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু না। এ জন্য আবূ হুরাইরাহ্ বলেন, একদা জিবরাঈল এসে বললেন :

হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদীজাহ্ আপনার নিকট আসছে, তাঁর সাথে আছে একটি পাত্র, তাতে আছে ব্যঞ্জন

---

* ***সহকারী অধ্যাপক,*** *বোয়ালিয়া মুজিযোদ্ধা কলেজ ও* ***খতীব,*** *মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[১২১] *সহীহুল বুখারী।*

[১২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৪২২।*

বা খাদ্য বা পানীয়। সুতরাং সে এলে আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানান। আর তাকে জান্নাতের (তার জন্য) ফাঁপা মুক্ত নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করুন– যেখানে কোনো হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না।[১২৩]

'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করেছেন; যেখানে কোনো হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না।[১২৪]

দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ! এই জন্য স্বামীর কাছে তাঁর কদর ছিল অনেক। যার কারণে তিনি জীবিত থাকাকালে নবী (ﷺ) অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি। তাঁর ইন্তিকালের পর বিবাহ করলে অন্য স্ত্রীদের কাছে রাসূল (ﷺ) খাদীজার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ফলে তাঁরা খাদীজার প্রতি ভীষণভাবে ঈর্ষা করতেন।

এ ব্যাপারে স্বয়ং 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী (ﷺ)-এর অপর কোনো স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কিন্তু নবী (ﷺ) অধিকাংশ সময় শুধু তাঁর কথাই আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিতে কোনো বিলম্ব করতেন না।

এজন্য আমি নবী (ﷺ)-কে মাঝে মাঝে রসিকতা করে বলতাম, "মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজাহ্ ছাড়া আর কোনো মেয়েই নেই। তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করে বলতেন, সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে– "নবী (ﷺ) যখন বকরী যবাই করতেন তখন বলতেন, খাদীজার বান্ধবীদের জন্য এই মাংস পাঠিয়ে দাও।"[১২৫]

মহানবী (ﷺ) শুধুমাত্র খাদীজার সখী বলেই তাঁদেরও কদর করতেন কেবল খাদীজার প্রতি ভালোবাসার টানে।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা খাদীজার বোন হালা বিনতু খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। সাথে সাথে তিনি খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন এবং আনন্দ বোধ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ! হালা বিনতু খুআইলিদ?[১২৬]

খাদীজার স্মৃতিচিহ্ন বলেই তার অলংকার দেখে একদা মহানবী (ﷺ)-এর হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁর কন্যা যয়নাবের স্বামী বদর যুদ্ধে বন্দি হন। তার মুক্তিপনস্বরূপ যয়নাব মায়ের দেওয়া হার পাঠান। তা দেখে মহানবী (ﷺ)-এর অন্তর বিগলিত হয় এবং সাহাবাগণকে বলেন,

"ইন রআয়তুম আন তুতলিকু লাহা আসিরাহা অতারুদ্দু আলাই হাল্লাজী লাহা।" অর্থাৎ- তোমরা যদি মনে করো যে, ওর বন্দীকে মুক্তি দেবে এবং তার জিনিস তাকে ফেরত দেবে (তাহলে ভালো হয়)।

সাহাবাগণ তাতে রাজি হয়ে সেই হার যয়নাবকে ফেরত দেন, যা ছিল তাঁর মায়ের স্মৃতি।[১২৭]

এ জন্য মা খাদীজাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলাদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূল (ﷺ) একদিন জমিনে চারটি দাগ টানলেন এবং বললেন : তোমরা কি জানো এটা কি? সাহাবীগণ বললেন : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন : জান্নাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা হলেন খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলীদ, ফাতিমাহ্ বিনতু মোহাম্মদ, মারইয়াম বিনতু 'ইমরান এবং আসিয়া বিনতু মাযাহিম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।[১২৮]

অনুরূপ অন্য একটি হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলো চারজন : মারইয়াম বিন্ত 'ইমরান, খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলীদ, ফাতিমাহ্ বিনতু মোহাম্মদ ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।[১২৯]

প্রকৃতপক্ষে খাদীজাহ্ ছিলেন বিবেক বুদ্ধি, সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ, বংশ মর্যাদায় সে কালের শ্রেষ্ঠ নারী। তবুও রাসূল (ﷺ)-এর আচার আচারণে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেভাবে তাঁদের দাম্পত্য জীবনকে অতিবাহিত করেছেন তা সমগ্র বিশ্বের মুসলমান (পুরুষ এবং মহিলাদের) অনুসরণ করা উচিত। আর অনুসরণ করলে প্রতিটি নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবন হবে সুখময়, মধুময় ও শান্তিময়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে অনুরূপ জীবন যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

---

[১২৩] *বুখারী- ৩৮২০; মুসলিম- ৬৪২৬; আহমাদ- হা. ৭১৫৬।*
[১২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮১৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪২৭।*
[১২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮১৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬৩১।*
[১২৬] *বুখারী- হা. ৩৮২০-৩৮২১; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৩৫।*
[১২৭] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৬৩৬২; সুনান আবূ দাউদ- ২৬৯৪।*
[১২৮] *মুসনাদ আহমাদ- ২৬৬৮, সনদ সহীহ।*
[১২৯] *মুসনাদ আহমাদ; ত্বাবারানী- হা. ৩৩২৮।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে সৃষ্টি করা হয় ইসরাঈলী রাষ্ট্র

–মো. আ. সাত্তার ইবনে ইমাম*

প্রাচীন হিব্রু সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার পূর্বে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসবাস ছিল বলে তাদের ধারণা।

বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট জুলফিকার আহমদ কিসমতি, তার 'চিন্তাধারা' গ্রন্থে ৫৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ১৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়ারু সালিম বা জেরুজালেম তথা বায়তুল মাকদিস ইহুদীদের হাতে ছিল বলে ধারণা করা হয়। অতঃপর খ্রিষ্টান রোম সম্রাট কাইসার বাজরিয়ান এটি ইহুদীদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর ইয়ারু সালেমের নাম অনুসারে এই শহরটির নামকরণ করা হয় ইয়ারু সালেম বা জেরুজালেম। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন ইয়ারু সালিম শব্দটি হিব্রু ভাষার। প্রাচীন ইতিহাসসমূহে যে অঞ্চলের নাম মাদাইন ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অঞ্চলেরই বর্তমান নাম ফিলিস্তিন। সিরাতে বিশ্বকোষ থেকে জানা যায়, এখানে অসংখ্য নবী-রাসূলদের জন্ম এবং পুণ্যভূমি, এখানেই বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখানেই নবী দাঊদ (আলাইহিস সালাম) সুলায়মান (আলাইহিস সালাম), দানিয়াল (আলাইহিস সালাম), জাকারিয়া (আলাইহিস সালাম), ইয়াহ্ইয়াহ (আলাইহিস সালাম), মারইয়াম (আলাইহিস সালাম), 'ঈসা (আলাইহিস সালাম), লুক্বমান (আলাইহিস সালাম), যুলকারনায়ন (আলাইহিস সালাম), ইউসুফ (আলাইহিস সালাম), শুআইব (আলাইহিস সালাম), আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম), ইউনুস (আলাইহিস সালাম), যুলফিকার (আলাইহিস সালাম), নবী ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)-সহ অসংখ্য নবী-রাসূলের জন্ম এই ফিলিস্তিন অঞ্চলে এবং তাদের কবরসমূহ ফিলিস্তিন অঞ্চলেই রয়েছে। মুসলমানদের সর্বপ্রথম কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিস বা মাসজিদুল আকসা। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (ﷺ) মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে মিরাজ গমনকালে এখানে নামায পড়েন এবং নবীদের ইমামতি করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মক্কা মদিনার পরেই স্থানটির মর্যাদা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসনকালে ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ হিজরিতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আমিরুল মু'মিনীন পরাজিতদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনিতে এসেছিলে। 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর পুরাতন মসজিদের স্থানে যেখানে হাইকলে সুলেমানি ছিল, তার ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যেখানে মহানবী (ﷺ) মি'রাজের রাতে এটি শনাক্ত এবং সত্যতা প্রমাণিত করেন। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট প্যালেস্টাইন একটি পবিত্র ভৌগোলিক এলাকা। তুর্কী শাসক দ্বিতীয় সেলিমের শাসনকালে ফিলিস্তিনি অঞ্চল তুর্কী শাসনের আওতায় চলে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালে তার পরি সমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ সালে। ১৯১৮ সালের পর থেকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিয়ে তালবাহানা করছে বিশ্ব নেতারা। শত বছরের অধিক কাল ধরে ফিলিস্তিনিরা নিজ আবাস ভূমি থেকে বিতাড়িত নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয়ে বিশ্ব নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। ফিলিস্তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের দাবির প্রতি কেউ কোনো ভ্রুক্ষেপ করছেন না। বরং ইসরাঈলের হাতকে শক্তিশালী করে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার সহযোগিতা করছে, করছে উৎসাহিত। শত বছরে আবাসভূমি নিয়ে লড়াই করে প্রাণ হারিয়েছে ফিলিস্তিনির লক্ষ লক্ষ মানুষ। ইংরেজিতে যাকে প্যালেস্টাইন বলা হয়, তাকেই ইতিহাসে ফিলিস্তিন বলা হয়। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রটি ছিল 'উসমানীয় শাসনের তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনি তার শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফিলিস্তিন তাদের শাসনেই ছিল ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া রাজবংশের পতনের পর আরব বিশ্বের শাসন ক্ষমতায় আসে 'আব্বাসীয় রাজবংশের শাসন। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ নগরী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, 'আব্বাসীয় সর্বশেষ খলিফা মুনতাসিম বিল্লাসহ বাগদাদের আরও ১৬ লক্ষ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে হালাকু খান। সেই সাথে 'আব্বাসীয় শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলমানদের

* *বিএ (অনার্স) এম এ (ডবল) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এমএম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাদ্‌রাসা দারুল ইসলাম মোহাম্মাদিয়া, বল্লা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।*

আরব বিশ্বের শাসন ক্ষমতা অনেকটাই টালমাটাল হয়ে যায়। অন্যদিকে তুরস্কের শাসন ক্ষমতায় আসে ‘উসমানীয় সুলতানগণ। ধীরে ধীরে আরব বিশ্বের অনেক অঞ্চলই তুর্কী ক্ষমতার শাসনে চলে যায়। আরবগণ মনে করত এটা তাদেরই আরব বিশ্বের অংশ। আরব বিশ্বে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, ঠিক তখন, আরবের শাসক শরীফ হুসাইনের স্বপ্ন ছিল আরব ফিলিস্তিন এবং লেবানন নিয়ে একটি জাতীয়তাবাদী সুশৃংখল আরব রাষ্ট্র গঠনের। তুর্কি প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার জন্য, আরবদের জন্য আরব এই নীতিকে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। লেবাননের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন দ্বিতীয় ফখরুদ্দিন (১৫৮৫-১৬৩৫) পরবর্তী পর্যায়ে ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে সাফাত অঞ্চলের অধিপতি জাহির আল ‘উমারের নেতৃত্বে লেবাননে প্যালেস্টাইনী কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়। জাহিরের মৃত্যুর পর আহমদ আল জাজ্জার লেবাননের স্বীয় আধিপত্য সু প্রতিষ্ঠিত করেন। তার একটি সুশৃংখল সেনাবাহিনী ছিল। সে সময় প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। সামন্ত অধিপতিদের প্রাধান্য থাকলেও প্যালেস্টাইন তুর্কি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। এই অঞ্চলে ইহুদী-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থানসমূহ অবস্থিত থাকায় প্যালেস্টাইনে ফরাসি ও রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নিয়ে রুশ ব্রিটেন তুর্কী ও ফ্রান্সের মধ্যে আলোচনা হয়। প্যালেস্টাইন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এটার পর একদল ব্রিটিশ ফৌজ মিসর হতে অভিযান করে প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবগণ মিত্র শক্তির পক্ষে যোগদান করে আশা করেছিলেন যে, যুদ্ধের পর তাদের অঞ্চলসমূহ তুর্কী শাসন হতে মুক্তি পাবে। যুদ্ধের পর ব্রিটেনের অনমনীয় ও বৈরী মনোভাবের ফলে আরবদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাহত হতে থাকে। তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগদান করায়, ব্রিটেন এবং আরবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে একটা সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে। ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরির জন্য মধ্যপ্রাচ্যের একটি জায়গার প্রয়োজন মনে করে। মক্কার শরীফ হোসেন এবং মিসরের হাইকমিশনার ম্যাকমোহনের মধ্যে পত্র বিনিময় হয় এবং ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে অক্টোবরে লিখিত এই পত্রে শরিফ হোসেনকে জানানো হয় যে, যুদ্ধের পর একটি আরব সাম্রাজ্য গঠনে মিত্র শক্তি সাহায্য করবে। বৃটেনের বৈরিতা ধৃষ্টতা প্রমাণিত হয় ব্রিটিশ সরকার ইহুদী জিওনিস্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী জাতির আবাসভূমি স্থাপনের পরিকল্পনা করে। এই মহা পরিকল্পনার ঘৃণ্য নায়ক ছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বালফোর। আর্থার বালফোর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে ইহুদী রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের প্রণীত একটি সংবিধানে ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে। প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের ২০০০/২৫০০ বছর পূর্বে এখানে বসবাস ছিল বলে তারা দাবি করতে থাকে। আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি ইহুদীরা জিওনিস্ট আন্দোলন শুরু করে। ইহুদীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাদের নিজস্ব আবাস ভূমির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে প্যালেস্টাইনে আসতে শুরু করে এবং বসতি স্থাপন করতে থাকে। তাদের একটি আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের সুইজারল্যান্ডের বালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জিওনিস্ট সম্মেলন। ইহুদীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল থিউডোর হারজল। একটি ঘোষণা মাধ্যমে ইহুদী রাষ্ট্রের আবাসস্থল স্থাপনের অঙ্গীকারবদ্ধ হয় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফোর। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন, মেন্ডেট, ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে আরবগণ এর তীব্রবিরোধিতা করে। হিব্রুদের আবাসভূমি প্যালেস্টাইনকে ইহুদীগণ তাদের আবাসস্থল মনে করে তারা প্যালেস্টাইনের জমি ক্রয় করা শুরু করে দেয়। এতে ইহুদী মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরব ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক দাঙ্গা সংঘটিত হয় ১৯২১, ১৯২৯ ও ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম কমিশন নিয়োগ করা হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বুলদানে আরবদের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আরব জাতি প্যালেস্টাইনে আধিপত্য কায়েমের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আরবগণ তাহাদের দাবি আদায়ের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে এবং ইহুদী ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনের মধ্যে

একজন ব্রিটিশ কমিশনার এই সংঘর্ষে নিহত হয়। এতে আরবদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলতে থাকে। ফিলিস্তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে প্যালেস্টাইনকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আরব ইহুদী ও ব্রিটিশ অধিকৃত জেরুজালেমকে। এ প্রস্তাব আরব ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করে। ইতিমধ্যে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে ৮০০ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। রাজা ফার্দানেন্ট রানী ইসাবেলা তথা ইহুদী খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে স্পেনের সর্বশেষ শাসক বু আব্দুর রহমান বিতাড়িত হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে স্পেনের ক্ষমতা মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়। সে সময় মুসলিম বিশ্বের শাসকেরা তাদের বিরুদ্ধে তখনো একত্রিত হতে পারেননি।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, সমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ সালে। তুরস্কের অধীনে ছিল ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করায়, ব্রিটেন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া চলে যায় তুরস্কের বিরুদ্ধে। আরবের শাসক শরীফ হোসাইনের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে মিত্র দেশগুলোর সাথে, এতে করে তুরস্ক কোন ঠাসা হতে থাকে, United Nation গঠিত হলেও, সেটা ছিল মূলত অকার্যকর। পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশগুলোর সাথে বিদ্যমান শক্তির মহড়াচলে ক্ষণে ক্ষণে। আবারো বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাস বইতে থাকে।

বিশ্ব শান্তির জন্য গঠন করা হয় বা United Nation। United Nation গঠিত হলেও বিশ্ব শান্তির জন্য অকার্যকর হয়ে পড়ে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কেউ কাউকে মানতে রাজি ছিল না। অবশেষে বিশ্ব পরিস্থিতি আরো অশান্ত হয়ে ওঠে। যখন ব্রিটিশ সরকার অনমনীয়তা প্রকাশ করে, ইহুদীরা মার্কিন সরকারের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার একটি শক্তিশালী ঘাঁটির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে, মার্কিন সরকার ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে নিজস্ব আভাস ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থন দান। এই সমর্থন লাভের জন্য ডাক্তার ওয়াৎসম্যানের নেতৃত্বে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল আমেরিকা গমন করে। নিউইয়র্কে একটি জিওনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিটমোর প্রোগ্রাম Beat more programme নামে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। লন্ডনে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিশ্বজিওনিষ্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট টু ম্যাইনকে চাপ দেয়। টু ম্যান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীকে একটি পত্রে প্যালেস্টাইনে ১ লক্ষ ইহুদীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরব জাহান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এর প্রতিবাদস্বরূপ গঠিত হয় আরব লীগ। এই আরবলীগ এ্যাংলো-মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখান করে প্যালেস্টাইনে আরব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প করে। প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য আরব লীগ আরব ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করে। ব্রিটিশ সরকার আরবদের প্রতি নমনীয় হলে ইহুদী সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের লন্ডনে আরব ইহুদী নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধার জন্য বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করে। জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটি প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণের পক্ষে রায় দেয়। আরব রাষ্ট্র, ইহুদী রাষ্ট্র ও জেরুজালেম রাষ্ট্র, এই অঞ্চলে তিনটি রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তাব করে। আরব লীগ মানতে রাজি হয়নি। ফলে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আরব ইহুদীদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবের বিজয় যখন সুনিশ্চিত তখন চার সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘ নির্দেশ প্রদান করে। এই সুযোগে ইহুদীগণ আমেরিকা ও রাশিয়া হতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে ফেলে। তেল আবিবে রাজধানী স্থাপন করে প্যালেস্টাইনের পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আরব জাহানের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও জাতিসংঘ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে নবগঠিত ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করে। আরব অংশ জর্ডান দখল করে নেয় এবং মিসরের সন্নিকটে ক্ষুদ্র এলাকাসমূহ মিসরের অধিকারে চলে যায়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হয়নি। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ২১ আগস্ট ইসরাঈল মুসলমানদের পবিত্র মসজিদুল আকসা অগ্নিসংযোগ

করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়ে খুব প্রকাশ করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিসরে ১৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানদের নিয়ে একটি শীর্ষ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ২২ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানদের নিয়ে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টিংকু আব্দুর রহমানকে মহাসচিব করে গঠন করা হয় organisation of Islamic conference। পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় (organisation of Islamic Co-operation OIC)। প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। OIC বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭টি রাষ্ট্র। প্যালেস্টাইনদের দাবি উত্থাপিত করার জন্য ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল PLO-Palestine Liberation organisation, বাংলায় যাকে বলা হয় ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা (ফিমুস) জনগণের সার্বিক মুক্তির জন্য গঠিত হতে থাকে বিভিন্ন মুক্তি সংস্থা, ফিলিস্তিনি গেরিলা ইউনিট এবং সামরিক ও বেসামরিক দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি মুক্তি সংস্থা। শেষ সময়ে প্রায় ৮০ লক্ষ ফিলিস্তিনি নিজ দেশে প্রবাস জীবনযাপন শুরু করে ইসরাঈল ও মুসলিম দেশগুলোর অনুমতিক্রমে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি থেকে যেসব মুসলমান বিতাড়িত হয়ে মিসরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তারা নিজ জন্মভূমির দাবিতে মিসরের ব্রাদার হুডের ন্যায় একটি শিক্ষিত শক্তিশালী প্রশিক্ষিত গেরিলা দল গঠন করেন ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে, যার নাম দেয় হামাস, প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন শেখ ইয়াসিন। PLO ওর প্রধান ছিলেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইয়াসির আরাফাত। শেখ ইয়াসিনও ছিলেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আরব রাষ্ট্রসমূহ চারবার ইসরাঈলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে (১৯৪৯, ১৯৫৬, ১৯৬৪, ১৯৭৩)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইসরাঈলকে সর্বপ্রকার সহায়তা করায় আরবদের পরাজয় বরণ করতে হয়। এতে বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা মৌলিক অধিকার আদায় করতে পারেনি। বিশিষ্ট ইতিহাস লেখক, সোহরাব উদ্দিন, তার লেখা "মুসলিম জাহান"গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। জর্ডানে দশ লক্ষ, লেবাননে পাঁচ লক্ষ, সিরিয়ায় ৩.৭৫ লক্ষ, কুয়েতে ২.৫০ লক্ষ অন্যান্য আরব দেশে ৯.২৫ লক্ষ পশ্চিম তীর ১০ লক্ষ, ইসরাঈলে ৮.২৫ লক্ষ গাজা ও সিনাই ৬.২৫ লক্ষ পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় তিন লক্ষ সে সময়ের হিসাব অনুযায়ী আট লক্ষ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু। বর্তমানে যার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১০গুণ। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ইসরাঈল বৈরুতে ফিলিস্তানি উদ্বাস্তুদের শিবিরে ও পিএলও, ঘাটির উপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। নিরাপত্তার জন্য তখন পিলওর হেডকোয়ার্টার তিউনিশিয়ায় সরিয়ে নেয়। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের তিউনিশিয়া পি এল ওর অফিসে ইসরাঈল বিমান হামলা করে বহু লোককে হত্যা করে। ত্রিপোলি শহরে আরাফাতের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সিরিয়া পন্থী গ্রুপ বিদ্রোহ করে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে আরব ইসরাঈলী নীতির পরিবর্তন আসে। তৎকালীন সৌদি যুবরাজ পরবর্তীতে বাদশা ফাহাদ আরব ইসরাঈল মীমাংসার জন্য আট দফা প্ল্যান দেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী পিরিজ হঠাৎ করে মরক্কোর বাদশা হাসান এর সাথে দেখা করে বন্ধুত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পি এলওর সঙ্গে তখন নতুন করে আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে চলে যায়। তখনকার সুভিয়েতপন্থী সিরিয়া ও ইরাক মার্কিন পন্থীদের এত সহজ বিজয় মানতে নারাজ ছিল। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্টে রিগ্যান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য তার পরিকল্পনা ঘোষণা করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের প্রস্তাব ছিল, সম্ভব হলে প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত শাসিত এলাকায় জর্দানের সাথে ফেডারেশনের মাধ্যমে স্থাপন করা হবে, প্রস্তাবে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী কে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিন জাতীয় কংগ্রেস ফিজাক সম্মেলনে রিগ্যান প্লেনে স্বাধীন ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র স্থাপনের কোনো বিধান নেই বলে একে গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। ইয়াসির আরাফাত রিগ্যানপরিকল্পনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে পিএলও এবং ইসরাঈল এই দুই প্রচণ্ড বৈরী শক্তি শান্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর

করে। ইযরাঈল ও প্যালেস্টাইনিদের গাঁজা এবং পশ্চিম তীরে সীমিত স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের অঙ্গীকার করে। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে মিসরের কায়রোতে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জুলাই ইসরাঈল ও জর্দান ওয়াশিংটনে এক ঘোষণার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার ৪৬ বছরের যুদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটায়। একই বছর ২৬ অক্টোবর দু'দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসন সম্প্রসারিত করা হয়। ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হওয়ার সাথে সাথে কুয়েত সৌদি আরব, আমিরাত এসব রক্ষণশীল আরব রাষ্ট্রগুলো ইরাকের পক্ষে তাদের সহানুভূতির জন্য ফিলিস্তিনিদের চরম নির্যাতন শুরু করে। ইসরাঈল ও প্যালেস্টাইনে এ প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধীতাও ছিল। এজন্য ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী রবিনকে এক চরমপন্থী ইহুদীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ৪ নভেম্বর হেবরন মসজিদে ২৯ জন মুসল্লিকে গুলি করে হত্যা করে আরেক উন্মত্ত ইহুদী। পেলেস্টাইনেরাও ক্ষুব্ধ হয়ে এই চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে বোমাবাজি করে। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ১ ও ২ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনে আরাফাত ও ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মধ্যে এক শীর্ষ বৈঠকের ব্যবস্থা করে। ফলে সাময়িকভাবে শান্তি আলোচনা আবার শুরু হয়। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ জানুয়ারি ব্যঞ্জামিন নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরস্তর শহর হেবরণ থেকে আংশিকভাবে ইসরাঈল সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। নেতা নিয়াহু নির্বাচনে জিতে ঘোষণা করলেন– (১) গোলান মালভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে না, (২) জেরুজালেমকে ভাগ করা হবে না এবং (৩) ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র ও স্থাপন করতে দেওয়া হবে না। পূর্বের চুক্তিতে ছিল যে, ধীরে ধীরে ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করবে। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ অক্টোবর ওয়েই নদীর তীরে আরাফাত ও নেতানিয়াহুর মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তির জন্য ভূমি চুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা স্থির হয় যে, ইসরাঈল আরও তেরো শতাংশ ভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং তিন শতাংশ থাকবে প্রাকৃতিক এলাকা যেখানে ইহুদী বসতি চলবে। গাজায় একটি বিমানবন্দর খোলা হবে এবং ইসরাঈল গাজা ও পশ্চিম তীরে দু'টি করিডোর স্থাপন করবে। যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, এমন ফিলিস্তিনিদের ইসরাঈল বন্দীদেরকে মুক্তি দিবে। ইযরাঈল কোনো চুক্তি কখনই বাস্তবায়ন করেনি। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা এবার মাঠে নেমেছে সর্বত্র শক্তি নিয়ে। হামাস ইসরাঈলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলেও তাদের সাথে আছে ইসলামী জিহাদ গোষ্ঠী, ফাতাহ, লেবাননের হিজবুল্লাহ গ্রুপ। হাজার হাজার ফিলিস্তিনিরা নিহত হচ্ছে ইসরাঈলের আক্রমণে। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এবারও পরাশক্তিগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তবে এবার বহির্বিশ্বের বহু দেশই ফিলিস্তিনিদের দাবিকে সমর্থন করছে। ইতিমধ্যে চীন রাশিয়া ইরান সৌদি আরব কুয়েত আরব আমিরাত মালয়েশিয়াসহ অন্তত ২২টি দেশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। তাছাড়াও ওআইসির সদস্য ৫৭টি দেশ ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করছে। বিতাড়িত হয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের এ দাবি খুবই গ্রহণযোগ্য, এ দাবি মেনে নেওয়া উচিত। এটা ফিলিস্তিনিদেরই দেশ। ইতিহাসের ভাষ্যমতে ইসরাঈল একটি পরগাছা অন্য রাষ্ট্র দখল করে নিজের রাষ্ট্র বানিয়ে ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইসরাঈল নামক কোনো রাষ্ট্র ছিল না।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে, ফিলিস্তিনিদের জীবন মরণ, নাগরিকত্ব ও বেঁচে থাকার অধিকারের দাবির কোনোই মূল্য নেই। বিজয় হোক ফিলিস্তিনিদের, বন্ধ হোক ফিলিস্তিনি হত্যা। কুরআনের ঘোষণা তোমাদের কি হইলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না, মহান আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ যার অধিবাসী জালিম সেটা হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় করো।[১৩০] যারা মু'মিন তারা মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল দুর্বল।[১৩১] হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন করো, অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।[১৩২] ❑

---

[১৩০] *সূরা আন্ নিসা : ৭৫।*
[১৩১] *সূরা আন্ নিসা : ৭৬।*
[১৩২] *সূরা আন্ নিসা : ৭০।*

ক্বাসাসুল কুরআন

ক্বওমে লূতের ধ্বংসের বিবরণ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

লূত (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি ‘বাবেল’ শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন‘আনে চলে আসেন। আল্লাহ তা‘আলা লূত (আলাইহিস সালাম)-কে নবুওয়াত দান করেন এবং কেন‘আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী ‘সাদূম’ অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, সা‘বাহ ও সা‘ওয়াহ নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল।[১৩৪]

ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এই জাতিটির বসবাস ছিল। এই জাতির কেন্দ্রীয় শহর ছিল ‘সাদূম’ নগরী। সাদুম ছিল সবুজ শ্যামল এক নগরী। কারণ এখানে পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল। ফলে ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং শস্যে ভরপুর। এমন প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রা বেপরোয়া করে তোলে তাদের। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমকামিতার প্রবণতা দেখা দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই জঘন্য অপকর্ম তারা প্রকাশ্যে করে আনন্দ লাভ করত। সেই বিকৃত রুচি হলো সমকামিতা। পৃথিবীতে তারাই প্রথম সমকামিতার পথকে উন্মুক্ত করে। লূত (আলাইহিস সালাম) তাদের এ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন। মহান আল্লাহর ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর আদেশ অমান্য করেছিল। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ○ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ○ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِيْ اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○ قَالُوْا يَا لُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ اِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ﴾

“এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লূতের নিকট এলো, তখন তাঁদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজেকে তাঁদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল– ‘এটা নিদারুণ দিন!’ তাঁর সম্প্রদায় তাঁর নিকট উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো এবং পূর্ব হতে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল– ‘হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?’ তারা বলল– ‘তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানোই।’ সে বলল– ‘তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের! তারা বলল– ‘হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশ্তা। তারা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না; তোমার স্ত্রী ব্যতীত। তাদের যা ঘটবে, তারও তা-ই ঘটবে। নিশ্চয়ই প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদকে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর।”[১৩৫]

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[১৩৪] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[১৩৫] *সূরা হূদ : ৭৭-৮২।*

ফেরেশ্তারা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং লূত (আলাইহিস সালাম)-এর বাসভূমিতে বা তার বাড়িতে পৌঁছেন। তাঁরা সুদর্শন যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন, যেন লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কৃওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। লূত (আলাইহিস সালাম) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কৃওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে ঘোরপেঁচ খেতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেন, "যদি আমি এদেরকে মেহমান হিসেবে রেখে দিই, তবে খুব সম্ভব আমার কৃওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে (তাদের সাথে দুষ্কর্ম করার উদ্দেশ্যে) দৌঁড়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসেবে আমার বাড়িতে না রাখি তবে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।" তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও ভয়াবহ দিন। আমার কৃওম তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে না, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কি যে ঘটবে!"

ইমাম সুদ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশ্তারা দুপুরের সময় নাহরে সুদূমে পৌঁছেন। সেখানে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কন্যা পানি নিতে আসলে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁকে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন : "এখানে আমরা কোথায় অবস্থান করতে পারি?" লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কন্যা উত্তরে বলেন : "আপনারা এখানে থাকুন, আমি ফিরে এসে উত্তর দিচ্ছি।" তিনি ভয় পেলেন যে, কৃওমের লোকেরা যদি এদেরকে পেয়ে যায় তবে তো এরা খুবই অপদস্ত হবেন। তাই তিনি বাড়ি গিয়ে তাঁর পিতাকে বলেন : "শহরের দরজার উপর কয়েকজন বিদেশি যুবককে আমি দেখে এলাম, যাদের মতো সুদর্শন লোক আমি জীবনে দেখিনি। যান, তাঁদেরকে নিয়ে আসুন, নতুবা আপনার কৃওম তাঁদের প্রতি যুলুম করবে।"

ঐ গ্রামের লোকেরা লূত (আলাইহিস সালাম)-কে বলে রেখেছিল, "কোনো বিদেশি লোক এখানে আসলে তুমি তাকে তোমার কাছে রাখবে না। আমরাই সব কিছু করবো।"

কন্যার মুখে খবর শুনে তিনি গিয়ে গোপনীয়ভাবে তাঁদেরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসলেন। কেউই এ খবর জানতে পারলো না। কিন্তু তারই স্ত্রীর মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদ শোনা মাত্রই তাঁর কৃওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুষ্কর্ম করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নবী লূত (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন : "তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ করো। স্ত্রীলোকদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করো।" অর্থাৎ- 'আমার কন্যাগুলো' একথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতের পিতার মতো।

লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁর কৃওমকে বললেন, স্ত্রী লোকেরাই এ কাজের যোগ্য; সুতরাং তোমরা তাদেরকে বিয়ে করে তোমাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর, এটাই হবে পবিত্র কাজ।

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁর কৃওমকে তার নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেননি; বরং নবী তাঁর সমস্ত উম্মতের পিতাস্বরূপ।

ইমাম ইবনু জুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, লূত (আলাইহিস সালাম) স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে না করেই তাদের সাথে মেলামেশা করতে বা সহবাস করতে বলেছেন; তাঁর উদ্দেশ্য এটা ছিল না; বরং তিনি স্ত্রী লোকদেরকে বিয়ে করে তাদের সাথে সহবাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফেরেশ্তাগণ লূত (আলাইহিস সালাম)-এর মনমরা অবস্থা লক্ষ করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেন : হে লূত (আলাইহিস সালাম)! আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছতে পারবে না (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে সরে পড়বেন। আপনি নিজে তাদের পেছনে থাকবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। আপনাদের কেউই যেন কৃওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং চিৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। এর থেকে তারা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবে না, সে তার কৃওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্না শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা, তার কৃওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ফায়সালা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়েই গেছে।

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী ও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কৃওমের চিৎকার শুনে সে

ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং 'হায় আমার কৃওম!' একথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সেও ধ্বংস হয়ে যায়।

লূত (আলাইহিস সালাম)-কে আরো সান্ত্বনা দানের জন্য তাঁর কৃওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন যে, সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে আর সকাল তো খুবই নিকটে।

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কৃওম তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা তাঁর দিকে তীর বেগে ধাবিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং নিজের ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তাদের চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়।

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাদের সকলকে একত্রিত করে তাদের ঘর-বাড়ী ও গবাদি পশুগুলিসহ উপরে উঠিয়ে নেন। এমন কি তাদের শব্দ এবং তাদের কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ আকাশের ফেরেশ্তাগণ শুনতে পান। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর ডান দিকের ডানার কিনারার উপর তাদের গোটা বস্তিকে উঠিয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি ওটাকে যমীনে উলটিয়ে দেন। ফলে তারা পরস্পর ভীষণভাবে ধাক্কা খায় এবং একই সাথে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবে ক্ষণিকের মধ্যে তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। বর্ণিত আছে যে, তাদের মোট চারটি গ্রাম ছিল এবং প্রতিটি গ্রামে এক লক্ষ করে লোক বসবাস করতো।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, তাদের তিনটি গ্রাম। সবচেয়ে বড় গ্রামটির নাম ছিল সুদূম। এখানে মাঝে মাঝে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আসতেন এবং তাদেরকে [লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কৃওমকে] উপদেশ দিতেন।

উক্ত জনপদে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারটি ব্যতীত মুসলমান ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আমরা সেখানে একটি বাড়ী ব্যতীত কোনো মুসলমান পাইনি।"[১৩৬] কুরআনী বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত গযব হতে মাত্র লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারটি নাজাত পেয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত[১৩৭]। তাফসীরবিদগণ বলেন, লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারের মধ্যে কেবল তাঁর দুই মেয়ে মুসলমান হয়েছিল। তবে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কৃওমের নেতারা লূত (আলাইহিস সালাম)-কে সমাজ থেকে বের করে দেবার যে হুমকি দেয়, সেখানে তারা বহুবচন ব্যবহার করে বলেছিল,

﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾

"এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। কেননা এই লোকগুলো সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়"[১৩৮]। এতদ্ব্যতীত শহর থেকে বের হবার সময় আল্লাহ লূত (আলাইহিস সালাম)-কে 'সবার পিছনে' থাকতে বলেন[১৩৯]। অন্যত্র বলা হয়েছে–

﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾

"অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবার সবাইকে নাজাত দিলাম"[১৪০]। এখানে أجمعين বা 'সবাইকে' শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঈমানদারগণের সংখ্যা বেশ কিছু ছিল। অতএব এখানে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবার বলতে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর দাওয়াত কবুলকারী ঈমানদারগণকে সম্মিলিতভাবে 'আহলে ঈমান' বা 'একটি ঈমানদার পরিবার' গণ্য করা যেতে পারে। তবে প্রকৃত ঘটনা যেটাই হোক না কেন, কেবলমাত্র নবীর অবাধ্যতা করলেই মহান আল্লাহর গযব আসাটা অবশ্যম্ভাবী। তার উপরে কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। হাদীসে এসেছে– 'ক্বিয়ামতের দিন অনেক নবীর একজন উম্মতও থাকবে না'।[১৪১]

এখানে লক্ষণীয় যে, নবীপত্নী হয়েও লূতের স্ত্রী গযব থেকে রেহাই পাননি। আল্লাহ তা'আলা নূহ্ পত্নী ও লূত পত্নীকে ক্বিয়ামতের দিন বলবেন–

﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾

"যাও জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও।"[১৪২]

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়্যেত' বা 'বাহরে লূত' নামে খ্যাত। এটি ডেড সি বা

[১৩৬] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৩৬।*

[১৩৭] *সূরা আল আ'রাফ : ৮৩।*

[১৩৮] *সূরা আল আ'রাফ : ৮২; সূরা আন্ নাম্ল : ৫৬।*

[১৩৯] *সূরা আল হিজ্র : ৬৫।*

[১৪০] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ১৭০।*

[১৪১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫২৯৬, অধ্যায় : 'রিক্বাক্ব', অনুচ্ছেদ : 'তাওয়াক্কুল ও সবর'।*

[১৪২] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ১০।*

৬৫ বর্ষ ॥ ০৯-১০ সংখ্যা ❖ ২৭ নভেম্বর- ২০২৩ ঈ. ❖ ১২ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৫ হি.

মৃত সাগর নামেও পরিচিত। ফিলিস্তিন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল অঞ্চলজুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে এটি। এটিকে আল্লাহ তা'আলা এমন নদী বানিয়েছেন যে, এতে কোনো জলজ প্রাণীও বসবাস করতে পারে না। একারণেই একে 'মৃত সাগর' বলা হয়।

সাদুম উপসাগরবেষ্টিত এলাকায় এক ধরনের অপরিচিত উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধুলাবালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর গন্ধক পাওয়া যায়। এই গন্ধক উল্কাপতনের অকাট্য প্রমাণ। এ শাস্তি এসেছিল ভয়ানক ভূমিকম্প ও অগ্নি উদগরণকারী বিস্ফোরণ আকারে। ভূমিকম্প সে জনপদকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। অগ্নি উদগরণকারী পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে তাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণ করেছিল।

বাইবেল ও গ্রিক ইতালির প্রাচীন গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে পেট্রলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের কূপ ছিল। কোনো কোনো স্থানে জমিন থেকে দাহ্য গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নের সঙ্গে পেট্রল ও গ্যাস জমিন থেকে বিস্ফোরিত হয়। সে বিস্ফোরণে গোটা অঞ্চল উড়ে যায়।

১৯৬৫ সালে ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানকারী একটি আমেরিকান দল ডেড সির পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বিরাট কবরস্থান দেখতে পায়, যার মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি কবর আছে। এটা থেকে অনুমান করা হয়, কাছেই কোনো বড় শহর ছিল। কিন্তু আশপাশে এমন কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ নেই, যার সন্নিকটে এত বড় কবরস্থান হতে পারে। তাই সন্দেহ প্রবল হয়, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল, তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাগরের দক্ষিণে যে অঞ্চল রয়েছে, তার চারদিকেও ধ্বংসলীলা দেখা যায়। জমিনের মধ্যে গন্ধক, আলকাতরা, প্রাকৃতিক গ্যাস এত বেশি মজুত দেখা যায় যে এটি দেখলে মনে হয়, কোনো এক সময় বিদ্যুৎ পতনে বা ভূমিকম্পে গলিত পদার্থ বিস্ফোরণে এখানে এক 'জাহান্নাম' তৈরি হয়েছিল।[১৪৩]

[১৪৩] *সীরাতে সরওয়ারে আলম- দ্বিতীয় খণ্ড।*

বর্তমান দুনিয়ায়ও অশ্লীলতা ও বিকৃত যৌনাচারের বেশ বাড়াবাড়ি রয়েছে। সমকামিতাকে কোনো দেশে বৈধতা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসকগোষ্ঠী। শুধু তাই নয়, অনেকে এই কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করছে এই কাজের প্রচার করছে। এমন বিকৃত যৌনাচারের কারণে মহান আল্লাহর গজব ত্বরান্বিত হয়। এমন সব অভ্যাসে মহান আল্লাহর গজব কোনো সতর্ক বার্তা দিয়ে আসে না। যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তাই প্রতিটি নাগরিকের উচিত এমন সব বিকৃত রুচিবোধ থেকে নিজে মুক্ত থাকা অন্যকে মুক্ত রাখা। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ব্যাপক হারে এই বিকৃত যৌনাচারকে সমূলে উৎপাটন করা। এই বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম কিংবা মতবাদ নয়, সব ধর্মের সব মানুষ এই বিকৃত যৌনাচারের বিরুদ্ধে যেতে হবে। ❑

মৃত্যু সংবাদ

০১. রংপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহা. আব্দুল হামিদ-এর একমাত্র ছোট বোন বিগত ১৪ নভেম্বর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিঊন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি স্বামী, দুই ছেলে, অনেক আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে জান। ইঞ্জি. এ. হামিদ আরাফাত পাঠক-পাঠিকার কাছে বোনের মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন করেছেন। মহান আরশের অধিপতি তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

০২. গত ৬ নভেম্বর সোমবার দুপুরে তলুইগাছা নিবাসী আহম্মাদ আলী গাজী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা (৮৬) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিঊন। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের প্রাক্তন সভাপতি ও কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা রফিউদ্দীন আনসারী ও জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম সেখানে উপস্থিত হয়ে মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। জানাযায় ইমামতি করেন জেলা সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে দু'আ করার অনুরোধ জানান হয়েছে। মহান আরশের অধিপতি তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : “ফেরেশ্তাগণ যেরূপ নূরের সৃষ্টি, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কেও তদ্রূপ নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।” এ ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের প্রবক্তাগণ স্বীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে একটি জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ কথা প্রচার করেন যে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কোনো ছায়া ছিল না। আর এ কথা যুক্তিযুক্ত যে, নূর বা আলোর কোনো ছায়া হয় না। জাল হাদীসটি নিম্নরূপ :

لم يكن يري له ظل في شمس ولا قمر.

যাকওয়ান থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, সূর্য ও চাঁদের আলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া দেখা যেত না।[১৪৪]

এ বর্ণনাটি জাল ও ভিত্তিহীন। কেননা, প্রথমত এ হাদীসের সূত্রে রয়েছে ‘আব্দুর রহমান ইবনু ক্বাইস যাফরানী, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের কঠোর মন্তব্য রয়েছে। বিজ্ঞ রিজালশাস্ত্রবিদ আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং ইমাম আবূ যরআ (রাহিমাহুল্লাহ-র) তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ ‘আলী সালেহ ইবনু (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, তথা ‘আব্দুর রহমান বিন কাইস যাফরানী হাদীস জাল করতো।

এছাড়াও তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ-র) ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ-র) প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামদের কঠোর উক্তি রয়েছে।[১৪৫]

অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ﴾

“তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সাজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে।”[১৪৬] আল কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে–

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

“আল্লাহকে সাজদাহ্ করে যা কিছু নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।”[১৪৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল কি-না এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য স্বয়ং নবী (ﷺ) কিংবা তাঁর নিকটতম সাহাবায়ে কিরামদের নিকটেই ছিল। এখন আমরা এ বিষয়ে জানব নবী (ﷺ) ও প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর সাহাবীগণের নিকট থেকে।

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক সফরে ছিলেন। সাথে ছিলেন সাফিয়্যাহ ও যায়নব। সাফিয়্যাহ নিজের উট হারিয়ে ফেলেন। যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে ছিল অতিরিক্ত উট। তাই নবী (ﷺ) যায়নবকে বলেন, সাফিয়্যার উট নিখোঁজ হয়ে গেছে। যদি তুমি তাকে তোমার একটি উট দিয়ে সাহায্য করতে তো ভালো হতো। উত্তরে যয়নব বলেন, হুঁম! আমি ঐ ইহুদীর মেয়েকে উট দেব? (অর্থাৎ- তিনি দিতে অস্বীকার করেন এবং সাফিয়্যাহকে ইহুদীর সন্তান বলে কটূক্তি করেন, কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী ছিলেন)। এ কটূক্তির কারণে নবী (ﷺ) যায়নবের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেন। যিলহাজ্জ এবং মুহাররম দুই কিংবা তিন মাস ধরে তার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকেন। যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। এমনকি শয়নের খাটও সরিয়ে ফেলি। এমনি এক সময় দিনের শেষার্ধে, নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়ার মধ্যে পাই। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন।[১৪৮]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে– যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। (এমতাবস্থায়) রবীউল আওয়ালে তার নিকট যান। ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ছায়া দেখতে পান এবং বলেন, এতো কোন পুরুষ মানুষের ছায়া বলে মনে হয়, (অথচ) তিনি তো আমার কাছে আসেন না। তাহলে এ ব্যক্তি কে? ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবেশ করেন।[১৪৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً إِذْ مَدَّ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخَّرَهَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ

---

[১৪৪] *খাসায়েলুল কুবরা- ১/১২২।*
[১৪৫] *তারীখে বাগদাদ- ১০/২৫১-২৫২; মিযানুল ই‘তিদাল- ২/৫৮৩; তাহযীবুত তাহযীব- ৬/২৫৮।*
[১৪৬] *সূরা আন্ নাহ্ল- ১৬/৪৮।*
[১৪৭] *সূরা আর্ রা’দ- ১৩ : ১৫।*
[১৪৮] *আহমদ- ৬/১৬৪-১৮২; আত্ ত্বাবাকাত আল কুবরা, ৮/১০০।*
[১৪৯] *মুসনাদে আহমাদ- হাঃ ২৬৮৬৬।*

صَنَعْتَ فِيْ هَذِهِ الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فِيْمَا قَبْلَهُ، قَالَ : أَجَلْ إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَالِيَةً قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئًا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَاسْتَأْخَرْتُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ ظِلِّيْ وَظِلَّكُمْ فِيْهَا.

সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, কোনো এক রাতে রাসূল (ﷺ) সালাতে ইমামতি করছিলেন। (এমতাবস্থায়) তিনি সহসা সামনের দিকে হাত বাড়ান এরপর তা আবার পেছনের দিকে টেনে নেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ), এ সালাতে আপনাকে এমন কাজ করতে দেখেছি যা ইতিপূর্ব কখনো করেননি? তিনি (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ! আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে পেলাম যেগুলোর ছড়া ঝুঁকানো ছিল। তা থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, আপনি পেছনে সরে দাঁড়ান। আমি সরে দাঁড়ালাম। তারপর আমার নিকট জাহান্নাম উপস্থিত করা হলো, যার আলোতে আমি আমার এবং তোমাদের ছায়া পর্যন্ত দেখেছি।[১৫০]

উল্লেখ্য যে, সহীহ ইবনু খুজাইমাহ্ কিতাবের সংকলক ইমামুল আয়িম্মাহ আবূ বক্বর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুজাইমাহ্ আস-সালামী আন্ নিসাপুরী আশ্ শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) (২২৩-৩১১ হিজরী)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি যখন তাঁর সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল তখন জাহান্নামের আগুনের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল; ফলে তখন নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের ছায়া পেছন দিকেই সরে গিয়েছিল। আর এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, নবী (ﷺ) সালাতরত অবস্থায় সম্মুখ থেকে পেছনের ছায়া কীভাবে দেখেছিলেন?

তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতরত অবস্থায় সম্মুখ থেকে পেছনে দেখারও ক্ষমতা রাখেন, যা ছিল তাঁর অন্যতম মু'যিজাহ্। এর পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল–

«إِنِّيْ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ».

নিশ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না। আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না।[১৫১]

[১৫০] *হাকীম- ৫/৬৪৮, মাঃশাঃ, ৮৪০৮; ইবনু খুজাইমাহ্- ২/৫০।*
[১৫১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ৪১৯০।*

وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَى مِنْ خَلْفِيْ كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ».

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি পেছনেও তেমনই দেখতে পাই, যেমনভাবে আশে পাশে দেখতে পাই।[১৫২]

আরো বর্ণিত হয়েছে–

ويئست منه فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت إن هذا لظل رجل وما يدخل علي النبي ﷺ فمن هذا فدخل النبي ﷺ.

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো ছায়া ছিল না বলে যে সব কথা বলা হয় তা সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট।[১৫৩]

উল্লেখ্য যে, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না" এ বিশ্বাস কেবল ঐ সকল ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ পোষণকারীদের– যারা বলেন, নবী (ﷺ) নূরের তৈরি, আর নূর বা আলোর কোনো ছায়া হয় না।

প্রকৃত সত্য হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমহান সৃষ্টি। কিন্তু তিনিও পিতৃ ঔরশে ও মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করা রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ...।"[১৫৪]

এছাড়া সত্যিই যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া না থাকতো, তবে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক বিষয় হিসেবে গণ্য হত আর অনেক সাহাবীই এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করতেন। অথচ এ সম্পর্কিত কোনো হাদীস নেই; বরং তাঁর ছায়া আছে মর্মে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতএব যৌক্তিক বিচারে এ কথা ধোপে টিকে না যে, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না।" আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস পরিহার সঠিক উপলব্ধিবোধ দান করুন –আমীন। *[সংকলন ও গ্রন্থনা : আবু ফাইয়ায]*

[১৫২] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হাঃ ৮১১/২২।*
[১৫৩] *আল কাউলুল মুফীদ- ১/৬৮।*
[১৫৪] *সূরা কাহ্ফ- ১৮/১১০; সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৪১/৬।*

সমাজচিন্তা

বক্তা-শ্রোতা ও মাহফিল আয়োজক : সকলের জানা জরুরি

লেখক : আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল*

ওয়াজ মাহফিলে বক্তা নির্বাচন ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। এ ক্ষেত্রে চলছে চরম দুরবস্থা ও ভয়াবহ শরিয়ত বহির্ভূত কার্যক্রম। তাই এ ব্যাপারে সর্বস্তরের মুসলিমদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

কারণ আমাদের অজানা নয় যে, বর্তমান সময়ে কারও চাপার জোর, সুললিত কণ্ঠ, হাসানো, কাঁদানো, কৌতুক, ড্যান্স, অভিনয়, গান-গজল, ইত্যাদি দ্বারা মাহফিল জমানোর মতো কৌশল, উস্কানি ও হুংকার মার্কা কথাবার্তা দিয়ে সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত করার মতো যোগ্যতা থাকলেই তিনি বিশাল বক্তা ও আন্তর্জাতিক মুফাস্সিরে কুরআনে পরিণত হন। অনুরূপভাবে সার্টিফিকেট, পদবী, সুন্দর চেহারা, ইংরেজি বলার দক্ষতা থাকলে তিনি বিশাল আল্লামা!

মাহফিলগুলোতে বিদেশ থেকে আগত, রেডিও-টিভির ভাষ্যকার, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ২৬ ইঞ্চি বক্তা, শিশু বক্তা, নারী থেকে পুরুষের রূপান্তরিত হওয়া বক্তা, নওমুসলিম বক্তা ইত্যাদি নানা অদ্ভুত উপাধি ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বক্তার চাহিদা তুঙ্গে। যেন এগুলোই বক্তা নির্বাচনের মানদণ্ড! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এগুলো আদৌ শরয়ী মানদণ্ডের মধ্যে পড়ে না।

যার কারণে বিশাল বিশাল ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হচ্ছে, সেগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হচ্ছে, এ উপলক্ষে জমজমাট প্রচার-প্রচারণা চলছে, এলাকার যুবকদের মাঝে মাহফিল নিয়ে অনেক উত্তেজনা কাজ করে, মাহফিল উপলক্ষে এলাকায় বিরাজ করে উৎসবের আমেজ। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, এগুলো অধিকাংশই সামাজিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক রুটিন ওয়ার্ক এবং অর্থ কালেকশনের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ওয়াজ মাহফিল থেকে মানুষ প্রত্যাশিত উপকার লাভ করে না, সেগুলো থেকে হিদায়েতের আলো বিচ্ছুরিত হয় না এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পাওয়া যায় না। এর কারণ অধিকাংশ ওয়াজ মাহফিল আয়োজনকারীদের নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সঠিক নয়। ফলে তারা বক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শরয়ী মানদণ্ড বিচার না করে মাহফিল জমানো ও আকর্ষণ সৃষ্টি করার মতো বক্তা অনুসন্ধান করে। ফলশ্রুতিতে একশ্রেণীর তথাকথিত বাজারি ও পেশাদার বক্তা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে মানুষকে কিভাবে আকর্ষণ করে স্টেজ মাতানো যায় সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে-যা খুবই দুর্ভাগ্য জনক এবং শরয়ী দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য।

যাহোক, নিম্নে আমরা ইসলামী আইন বিষয়ক বিশ্বকোষ 'আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আল কুয়েতিয়্যা' থেকে ওয়ায়েজ বা ধর্মীয় বক্তার মধ্যে কী কী শর্তাবলী এবং শিষ্টাচার থাকা কর্তব্য সেগুলো উপস্থাপন করব ইন্শা-আল্লাহ।

ওয়াজকারী বা বক্তার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে : যথা-

এক. শরিয়তের বিধিবিধান আবশ্যিকভাবে অর্পিত হওয়ার মতো উপযুক্ত হওয়া অর্থাৎ- তিনি সুস্থ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হবেন।

দুই. ন্যায়-নীতি ও আদর্শবান হওয়া।

তিন. মুহাদ্দিস হওয়া : অর্থাৎ- তিনি হাদীস শাস্ত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখবেন, হাদীস পাঠ করবেন, হাদীসের শব্দাবলীর অর্থ বুঝবেন এবং তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখবেন-যদিও তা কোনো বড় মুহাদ্দিস অথবা কোনো ফিকহবিদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে হয়।

চার. মুফাস্সির হওয়া : অর্থাৎ- তিনি কুরআনের দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দাবলীর অর্থ জানবেন ও (বাহ্যত) সমস্যাপূর্ণ বিষয়গুলোর সঠিক সমাধান জানবেন এবং সে সম্পর্কে পূর্বসূরি তাফসীরকারকদের থেকে বর্ণিত তাফসীর সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন।

পাশাপাশি তার জন্য এমন বাগ্মী ও সুভাষী হওয়া উত্তম যে, তিনি মানুষের ধারণ ক্ষমতার বাইরে কথা বলবেন না। সেই সাথে তিনি হবেন নম্র, ভদ্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

তিনি দীনের বিষয়গুলোকে মানুষের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করবেন; জটিলতা সৃষ্টি করবেন না।[১৫৫]

[৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]

* *জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।*

[১৫৫] *আবজাদুল উলুম- ২/৫৩৬, প্রকাশনী : দারুল কুতুবুল ইলমিয়া।*

কিশোর ভুবন

আমি অজগর! আমাকে ভয় পেও না

মূল : আব্দুত তাওয়াব ইউসুফ

অনুবাদ : হাফিজুর রহমান*

তোমরা আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ বুঝি! প্লিইইইজ ভয় পেয়ো না! আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না। আমি তো অনেক দূরে থাকি। তোমরা কি জানো আমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি মক্কা শহরে। যেই শহরে সবার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) থাকতেন। মক্কা শহরের দারুন নাদওয়া নামের একটি বাড়ির দেয়ালে আমি থাকি। মক্কার মানুষ এই বাড়িতে বসে তাদের দরকারী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতো।

তোমাদেরকে আমার একটা গল্প বলি। একদিন আমি আমার ঘর থেকে বের হয়ে শহরে যাচ্ছিলাম। চলতে চলতে হঠাৎ দেখি আমার পরিচিত একজন কালো পোষাক পরে এদিকেই আসছে। তোমরা কি জানতে চাও সে কে ছিল? সে ছিল ইবলিশ শয়তান! আমি তাকে বললাম, 'আরে শয়তান ইবলিশ! কী খবর? সে বললো, 'চুপ করো। কেউ তোমার কথা শুনে ফেললে সমস্যা হবে।' আমি বললাম, 'তুমি এখানে কী করছো?' সে বললো, 'আমি মুহাম্মাদ নামের লোকটাকে খুঁজছি। তার একটা দফারফা করতে হবে। নয়তো সে তার শক্তি দিয়ে পুরো পৃথিবী পাল্টে ফেলবে। আমাদের অনেক ক্ষতি করে ফেলবে। বন্ধু! তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো!'

তার এই কথা শুনে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো। অনেক আগে আমি একবার ইবলিশকে সাহায্য করেছিলাম। আমার সাহায্য নিয়ে ইবলিশ এমন কিছু পচা কাজ করেছিল যে, মানুষ এখনো আমাকে দুষ্টু বলে। আমাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। কেউ আমাকে পছন্দ করে না। ইবলিশের কারণেই আমার এই অবস্থা। তাই এখন যদি আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছ থেকে ইবলিশকে দূরে রাখতে পারি আর আমিও তার কাছ থেকে দূরে থাকি তাহলেই ভালো।

আমি এসব ভাবতে ভাবতেই একদল লোক সেখানে চলে আসলো। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে লুকোলাম। আর ওই লোকেরা বসে বসে ইবলিশের সাথে পরামর্শ করতে লাগলো কিভাবে মুহাম্মাদের একটা ব্যবস্থা করা যায়। একজন বললো, 'আমরা তো তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারি।' ইবলিশ বললো, 'আটকে রাখা যাবে না। সে পালিয়ে যেতে পারে।' আরেকজন বললো, 'তাহলে আমরা তাকে আমাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেই।' ইবলিশ বললো, 'তাকে তাড়িয়ে দিলে তো সে আবার ফিরে আসবে।' এভাবে একজন একজন করে অনেকেই বিভিন্ন বুদ্ধি দিলো, কিন্তু কারো বুদ্ধিই সবার পছন্দ হলো না। সবার শেষে বুদ্ধি দিলো ইবলিশ। সে বললো, 'শোনো! মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে শক্তিশালী যুবক বাছাই করা হবে। তারা মুহাম্মাদের বাড়িতে যাবে। মুহাম্মাদ বাড়ি থেকে বের হলেই তারা সবাই মিলে তাকে হত্যা করবে।' তার এই বুদ্ধি সবাই খুশি হয়ে মেনে নিলো।

রাতের অন্ধকারে আমি মুহাম্মাদের বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বাড়ির চারদিকে ঘিরে বসে আছে। কেউ কেউ দরজার ফুটো দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে মুহাম্মাদ ঘরে আছে কি-না। মুহাম্মাদ (ﷺ) তখন চাদর গায়ে দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এটা দেখে তারা তাকে হত্যা করার জন্য বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু কথায় আছে, 'রাখে আল্লাহ মারে কে।' মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মারার জন্য যারা বসে ছিল হঠাৎ করেই তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। তাদের সাথে সাথে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের ঘুম ভাঙলো একেবারে ফজরের সময়, সূর্য যখন ওঠে, তখন। সবাই তখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ঘরে ঢুকে পড়লো। ঢুকে দেখলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিছানায় তার চাচাতো ভাই 'আলী ঘুমিয়ে আছেন। তারা 'আলীকে ডেকে বললো, 'তুমি মুহাম্মাদের বিছানায় শুয়ে আছো কেন? মুহাম্মাদ কোথায়?' 'আলী বললেন, 'আমি জানি না।'

* *অধ্যয়নরত, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

আসলে ভোরের অনেক আগেই মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার সাথী আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কা থেকে বের হয়ে 'সাওর' নামের একটি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অবস্থা দেখে ইবলিশ সবাইকে বললো, 'এভাবে আশা ছেড়ে দিলে কি হবে? মুহাম্মাদকে খুঁজুন সবাই মিলে। তার পিছু নিন।' রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ইবলিশ আমাকে বললো, কি ব্যাপার! তুমি কি মুহাম্মাদের পিছু নিতে পারলে না? তাকে থামাতে পারলে না?' আমি বললাম, 'আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই তো তিনি চলে গেছেন।' ইবলিশ বললো, 'তুমি আর তোমার সব বন্ধু মুহাম্মাদকে থামানোর চেষ্টা করবে। তাকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।'

এরপর ইবলিশ সুরাকা ইবনু মালেক নামের একজনকে বললো, 'তোমার তো অনেক জোরে দৌড়ায় এমন একটা ঘোড়া আছে। তুমি সেই ঘোড়াতে চড়ে মুহাম্মাদকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ো। তাকে ধরতে পারলে অনেক পুরস্কার পাবে।' ইবলিশের কথা শুনে সুরাকা বেরিয়ে পড়লো।

এদিকে আমার বন্ধু এক সাপ ইবলিশের কথামতো সাওর পাহাড়ের একটি গুহায় মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার সাথী আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র অপেক্ষায় বসে ছিল। মুহাম্মাদ (ﷺ) ও আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন সেই গুহায় পৌঁছলেন তখন আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে কয়েকটা গর্ত দেখতে পেলেন। তিনি সেই গর্তগুলো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিলেন। কাপড়ের টুকরো শেষ হয়ে যাওয়ায় একটা গর্ত কিন্তু খোলাই রয়ে গেলো! আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই গর্তে তার পা ঢুকিয়ে গর্তটা বন্ধ করলেন। মুহাম্মাদ (ﷺ) তখন তার গায়ে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় সেই সাপটা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পায়ে দিলো এক কামড়। আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব ব্যথা পেলেন। ব্যথা তার পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। তখন মুহাম্মাদ (ﷺ) কামড়ের জায়গায় তার হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি তো আল্লাহর নবী! তাই তার হাতের ছোঁয়ায় সব ব্যথা ভালো হয়ে গেলো।

কেউ মুহাম্মাদ (ﷺ) ও আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কোনো রকম ক্ষতি করতে পারলো না। তারা নিরাপদে মদীনা পৌঁছে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। ❑

বক্তা-শ্রোতা ও মাহফিল আয়োজক : সকলের জানা জরুরি

[৩৬ পৃষ্ঠার পর]

বক্তার কতিপয় শিষ্টাচার : ওয়ায়েজ (বক্তা), আলেম এবং শিক্ষকের অন্যতম শিষ্টাচার হলো– তিনি এমন সব কথাবার্তা, কার্যক্রম ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করবেন যা বাহ্যত ভুল মনে হয়– যদিও তিনি এ ক্ষেত্রে নির্ভুল হন। কারণ তিনি এমনটি করার কারণে (সাধারণ মানুষের মাঝে) বিভিন্ন সমস্যা ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। যেমন-

✪ কারও মধ্যে এমন বিষয় জানা গেলে অনেকেই ধারণা করে বসবে যে, এটা সর্বাবস্থায় জায়িয। ফলে তা শরিয়তের বিধান বা 'আমলযোগ্য বিষয়ে পরিণত হবে– যে বিশেষ পরিস্থিতিতে তা করা হয়েছিল তার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না।

✪ বক্তা যদি নাজায়িয কর্মে জড়িত হয় তাহলে মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, তার সমালোচনা করবে এবং তার থেকে দূরে সরে যাবে।

✪ মানুষ তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং মানুষকেও তার ব্যাপারে সাবধান করবে যেন তার থেকে কেউ 'ইল্‌ম গ্রহণ না করে।

✪ তার সাক্ষ্য ও বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য হবে। তার দেওয়া ফাতাওয়ার 'আমল প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তার 'ইল্‌মি কথা-বার্তার ব্যাপারে মানুষের মন থেকে আস্থা চলে যাবে ইত্যাদি।

ওয়াজ মাহফিলে অর্থ কালেকশন নাজায়িয : ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে এসেছে– "বক্তার জন্য ওয়াজ মাহফিলে মানুষের কাছে কোনো কিছু চাওয়া জায়িয নেই। কারণ তা 'ইল্‌ম-এর মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জন।"[১৫৬]

[উৎস : আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যা বা কুয়েতি ফিকাহ বিশ্বকোষ- ৪৪/৮১-৮৩, অনলাইন ভার্সন, সংক্ষেপায়িত]

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে সবচেয়ে সঠিক ও সুন্দর পদ্ধতিতে মহান আল্লাহর দীনের আহ্বানকে গণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার তাওফীক্ব দান করেন আর আমরা যেসব হিদায়েতের কথা মানুষকে বলবো তা যেন কর্মে বাস্তবায়ন করতে পারি রাব্বুল 'আলামিনের নিকট সেই তাওফীক্ব কামনা করি। ❑

[১৫৬] *ফাতাওয়া হিন্দিয়াহ- ৫/৩১৯।*

কবিতা

মানসপটে

মোল্লা মাজেদ*

দিন অবসান কালো আসমান সন্ধ্যা ঘনায় তটে
আমার ভাগ্যে কোন অলক্ষ্যে কখন কি যেন ঘটে।

দিন গেল খেয়ে মরণ সুধা
মিটবে কি আর মনের ক্ষুধা
অতৃপ্ত মনে বসে এই ক্ষণে আছি মহা সংকটে,
আমার ভাগ্যে কোন অলক্ষ্যে কখন কি যেন ঘটে।

উথলা নদী বহে নিরবধি ক্ষুরধার খরতর
কান পেতে শুনি বসে দিন গুনি এই এলো সেই ঝড়।

কি আছে লেখা ভাগ্য লিখন
যার লাগি মন বড় উচাটন
ফেলে আসা দিন ছিল যে রঙিন জাগে এ মানসপটে,
আমার ভাগ্যে কোন অলক্ষ্যে কখন কি যে ঘটে।

রব তোমার নিকট চাই

এইচ আর আবু হোরায়রা*

হে রব! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা চাই
আমি তোমার নিকট বৈধ রুজি চাই
আমি তোমার নিকট গ্রহণীয় 'আমল চাই
হে চিরস্থায়ী! হে চিরন্তন! তোমার দয়ার মাধ্যমে,
আমি তোমার নিকট সাহায্য চাই।
তোমার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই,
তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই।
তোমার নিকট আমার দ্বীন দুনিয়াও
পরিবার পরিজন সম্পদের নিরাপত্তা চাই।
তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার
অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই।
তোমার শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই
জাহান্নামের 'আযাব হতে আশ্রয় চাই।
কবরের 'আযাব হতে আশ্রয় চাই
কানা দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাই
জীবন মৃত্যুর পরীক্ষা হতে আশ্রয় চাই।
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই।
তোমার কাছে সর্বদা হিদায়েত চাই
ঈমান ও 'আমল নিয়ে বাঁচতে চাই
বিশ্বনবী (ﷺ)-এর আদর্শ মানতে চাই
মুসলিম হয়ে মরতে চাই। –আমীন

দাও তব ভালোবাসা

মো. গিয়াসউদ্দিন*

প্রভু! আমি গুনাহগার, নাই ভালো 'আমল,
পুলসিরাতে দৃঢ় রাখো মোর পদযুগল।
তোমার রহমত ঢেলে দাও মোর অন্তরে,
সকল 'আযাব হতে তুমি রক্ষা করো মোরে।

পাপী-তাপী বান্দা আমি নিরাশায় করি আশা,
তপ্ত প্রাণের ছোঁয়ায় দাও তব ভালোবাসা।
তোমার যিক্‌রে খুলে দাও সকল বাঁধন,
দাও নিয়ামত, রহমত মনের মতন।

নেক বান্দাদের মাঝে মোর করে দাও ঠাঁই,
দুনিয়াতে থেকে যেন বেহেস্তের স্বাদ পাই।
প্রিয় বান্দাদেরকে তুমি যা করে থাকো দান,
সে সব জিনিস দিয়ে বাড়াও মোর সম্মান।

যতদিন বাঁচিয়ে রাখো এ ধরণীর পর,
মু'মিন রূপে সম্মান দাও সবার উপর।

'আযাব দাও তাদের যারা মানে না কুরআন,
রাসূলদের করে না স্বীকার করে অসম্মান।
কাফির মুশরিকদের অন্তরে দাও ভয়,
দাও তাদের মাঝে অনৈক্য, শাস্তি, পরাজয়।

মহান আল্লাহর বিধান তারা করে থাকে লঙ্ঘন,
সহজ সরল পথ করে না অবলম্বন।
শিরকে লিপ্ত তারা করে অন্যের উপাসনা,
তুমি মহান, পবিত্র, দাও তাদের লাঞ্ছনা।

সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিও আখিরাতে,
হাশ্‌রের দিন 'আমলনামা দিও ডান হাতে।
প্রভু! মহা প্রজ্ঞাময় বিশাল তব নিখিল,
সফলকামদের মাঝে করো মোরে শামিল।

---

* *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

* *সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, বগুড়া জেলা শুব্বান।*

* *৭০২, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা-১২০৬।*

জমঈয়ত সংবাদ

আহলে হাদীস তালীমী বোর্ডের পরীক্ষা সম্পন্ন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ আহলে হাদীস তালীমী বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা-২০২৩ গত ১৬ নভেম্বর শুরু হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহী, চাপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, খুলনা, চট্টগ্রাম, পাবনা ও গাইবান্ধা জেলার নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন কুল্লিয়া, সানাবিয়া, মুতাওয়াসসিতা ও হিফয বিভাগের শিক্ষার্থীগণ। বোর্ড প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিটি কেন্দ্রে সুষ্ঠু-সন্দুরভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বোর্ডের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাজশাহী পশ্চিম জেলা জমঈয়ত শাখা দায়িত্বশীল সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার, রাজশাহী পশ্চিম জেলার তানোর উপজেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ ও শাখা দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত এ সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা জমঈয়তের সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, জেলার সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ ফারুক, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক শাইখ আব্দুল গফুর মাদানী, মোহনপুর উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ নির্যাতিত-নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন ও ইসরাঈলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন; সেই সাথে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে দাওয়াতি কাজকে আরো ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও নেতৃবৃন্দ পুরাতন শাখাগুলোকে সক্রিয়করণ এবং মসজিদভিত্তিক শাখা গঠনের রূপরেখা প্রদান করেন। এ সভায় যুব সংগঠন শুব্বানকে সক্রিয় ও শক্তিশালীকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বক্তব্যে আরো অংশগ্রহণ করেন দেবীপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ এবং উপজেলা জমঈয়তের প্রধান উপদেষ্টা শাইখ আশেকে ইলাহী ও জেলা জমঈয়তের সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হারুন। সভা পরিচালনা করেন তানোর উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি মো. আসলাম উদ্দীন।

ঝিনাইদহ জেলা জমিঈয়তের সাংগঠনিক কর্মসূচি

ঝিনাইদহ জেলা জমিঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে জেলা জমিঈয়ত নেতারা গত ২৭ অক্টোবর শুক্রবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের তিনটি মসজিদ সফর করেন। এ সফরে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, জেলা জমঈয়তের তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সামাদ, ঝিনাইদহ জেলা শুব্বান সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মুহা. সাবিত বিন আব্দুর রশীদ, সৌদি প্রবাসী মুহা. আক্তারুজ্জামান, পশ্চিম লক্ষীপুর তাহফিযুল কুরআন ও দারুল হাদীস মাদরাসার হাফেয মুহা. আরজুল্লাহ প্রমুখ।

বাদ জুমু'আহ্ পশ্চিম লক্ষ্মীপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমিঈয়তের তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সামাদের উপস্থাপনায় ও হাফেয মুহা. মুহায়মেনের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সাংঠনিক সভার কার্যক্রম শুরু হয়। জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভা শেষে সদ্য মৃত্যুবরণকারী ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি মুহা. নুরুল ইসলাম (রহিমাহুল্লাহ)-এর বাড়িতে জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ গমন করেন এবং তার পরিবারের খোঁজ-খবর নেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

রংপুর জেলা জমঈয়তের সাধারণ সভা

গত ২৮ অক্টোবর শনিবার, রংপুর শহরের সেন্ট্রাল রোড আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ মাহমুদার রহমান সোনার সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়ত সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আমাগী ২ মার্চ' ২৪ শনিবার, রংপুর জেলা জমঈয়তের

ইসলামী সম্মেলন মাদরাসাতুন্নববীয়া মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

এছাড়াও জেলা জমঈয়তের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো বেশি মনোযোগী এবং জমঈয়তের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস প্রতিটি শাখায় পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শেষে সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলা সদরে কমিটি গঠন ও অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে সাধারণ সভা

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলা সদরে আহলে হাদীস জামে মসজিদে গত ২৮ অক্টোবর এলাকা কমিটি গঠন ও অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা আবুল হাশেম মেম্বারের সভাপতিত্বে বাদ আসর অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা জমঈয়তের সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান সরকার। জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমের পরিচালনায় উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন সভার আহ্বায়ক আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুল জলিল। প্রধান আলোচক ছিলেন ডক্টর শফিকুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুর রহমান, সেক্রেটারি মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুর রব মেম্বার, প্রচার সম্পাদক আবুল হোসেন, আহলে হাদীস মসজিদ কমিটির সভাপতি মাজেদুল ইসলাম মেম্বার, জেলা শুব্বান সভাপতি আতিক চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবক দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু, প্রফেসর মহসিন রেজা, গ্রাম প্রধান তোফাজ্জল হোসেন কেলু, হাফেয মাওলানা রুহুল আমিন, মুহাম্মদ ইসহাক, হুমায়ন কবির, মাওলানা এবাদুর রহমান চৌধুরী এবং বুড়িচং উপজেলার পূর্ব এলাকার জমঈয়ত ও শুব্বানের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

অতিথিবৃন্দের আলোচনার পর আলহাজ্জ আবদুল জলিলকে সভাপতি ও গাজী মোসলেহ উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে সাংগঠনিক সভা

গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার, বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে মহান আল্লাহর দান জামে মসজিদ শাখার সংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত। বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহান আল্লাহর দান শাখা জমঈয়তের সহ-সভাপতি মো. হাফিজুর রহমান এবং পরিচালনা করেন শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন মোহাম্মদ রায়হান।

এ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম ও সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম। নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর জন্য উপস্থিত সকলকে দু'আ করতে বলেন এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ত্রাণফান্ডে সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

এ সভায় ডা. মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন গঠনতন্ত্র থেকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সকলের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শুনান এবং মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করার প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

খিলগাঁও আহলে হাদীস জামে মসজিদ কর্তৃক পরিচালিত 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাফেযিয়া মাদ্‌রাসা'র জন্য একজন অভিজ্ঞ হাফেয প্রয়োজন।

আগ্রহী প্রার্থীকে আগামী ৩০/১২/২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক চারিত্রিক সনদপত্রসহ সভাপতি বরাবর নিম্নের ঠিকানায় ডাক/কুরিয়ারযোগে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ

১১৪২/এ, তিলপাপাড়া, রোড নং- ১৬,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
✆ ০১৯৩৪-৪০৪২৮৬, ০১৭৩৬-০৬২৮৪১

শুব্বান সংবাদ

কেন্দ্রীয় শুব্বানের অনলাইন সালেহ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, অনলাইন প্লাটফর্ম জুমঅ্যাপস-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সালেহ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ গাজীর সঞ্চালনায় প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

অনলাইন কেন্দ্রীয় সালেহ কর্মশালায় 'আহলে হাদীস আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের ভূমিকা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন। 'সালেহ শপথের দাবি' শীর্ষক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়।

এতে 'ফিলিস্তিনের বিদ্যমান সংকট : অনিবার্য বাস্তবতা' বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, 'কুরআন ও হাদীসে মসজিদুল আকসার তাৎপর্য' বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী এবং 'ফিলিস্তিনের ইতিহাস' বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ। দ্বিতীয় অধিবেশনটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচিত্র প্রচারিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের ১০ম সেশনের ২য় সভা অনুষ্ঠিত

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম সেশনের মজলিসে ক্বারারের দ্বিতীয় সভা গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ঢাকার যাত্রাবাড়ীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বিন হারিছের সঞ্চালনায় পাঠাগার সম্পাদক তাকী উদ্দীনের কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শেষে দারসুল হাদীস পেশ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আকবর আলী। এ সভায় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী। সভায় নীতি-নির্ধারণী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি সবাইকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে ফিলিস্তিনি মজলুম মুসলিম ভাইদের জন্য দু'আ করেন। সভায় ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আমাদের করণীয়, শুব্বানের চলমান কর্মসূচিসহ বেশ কিছু বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যশোর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৮ অক্টোবর, শনিবার যশোর জেলা শুব্বানের ৯ম কাউন্সিল অধিবেশন কেশবপুর আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জেলা শুব্বান সভাপতি শায়খুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক হুমায়ুন কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামের প্রথম পর্ব দাওয়াহ অধিবেশনের শুভ উদ্বোধন করেন যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক আহমাদ আলী এবং সাংগঠনিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রথম আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সের পরিচালক শাইখ ড. মুজফফর বিন মহসিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র সহ-সভাপতি, মাওলানা আব্দুর রশিদ, সহ-সভাপতি, মাস্টার লিয়াকত আলী, সেক্রেটারি, মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, যুগ্ম-সেক্রেটারি, অধ্যাপক তৌহিদুল ইসলাম, শুব্বান বিষয়ক

সেক্রেটারি, মাওলানা মো. ইকবাল হোসেন, ঝিকরগাছা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি হাফেয এস এম মাশকুর আলম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ২০২৩-২০২৫ সেশনের যশোর জেলার নব-নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর নাম ঘোষণা করেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শায়খুল ইসলাম ও মাস্টার আব্দুল আহাদ।

কেশবপুর-মনিরামপুর উপজেলা শুব্বানের ২০২৩-২০২৪ সেশনের নব-নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেন তানজিল আহমাদ। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাস্টার মো. আব্দুল হান্নান ও মো. নজরুল ইসলাম।

ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের ৬ষ্ঠ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১১ নভেম্বর শনিবার ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের ৬ষ্ঠ কাউন্সিল অধিবেশন ঠাকুরগাঁও রোড কমিউনিটি সেন্টারে জেলা শুব্বানের সভাপতি মো. দেলাওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদ রেজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের শুভ উদ্বোধন করেন ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মঞ্জুরে খোদা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী ও প্রধান আলোচক ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি শাইখ আসাদুল্লাহ খাঁন গালিব মাদানী।

বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, নীলফামারী জেলা শুব্বানের আহ্বায়ক আহমাদুল্লাহ, ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কমিটির সদস্য মো. ফজলে কাদের খাঁন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী ২০২৩-২০২৫ সেশনের ঠাকুরগাঁও জেলার নব-নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-এর নামসহ পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মো. মাসুদ রেজা ও মো. জুয়েল রানা।

নরসিংদী জেলার ২৭টি মসজিদে শুব্বানের তাবলীগী সফর

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক নেতৃত্বে সংগঠনের দাওয়াতি টিম গত ২৭ অক্টোবর শুক্রবার নরসিংদী জেলায় সফর করেন। যাত্রাবাড়ীর জমঈয়ত ভবন থেকে নরসিংদী জেলার উদ্দেশ্যে সকাল ৮টায় সফর শুরু হয়। নরসিংদী জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের সহযোগিতায় সফরকারী নেতৃবৃন্দ জেলার ২৭টি মসজিদে জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন। মাধবদী বাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে পৌঁছানের পর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক খতীবদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক মসজিদের জন্য সৌদি আরবের ছাপা একসেট তাফসীর, দু'আর বই, শুব্বানের চাবির রিং, ফর্‌য সলাত পর পঠনীয় আযকার (ফেস্টুন), শুব্বান পরিচিতি প্রদান করা হয়।

এ সফরে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, শুব্বানের সহ-সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, মাদরাসাতুল হাদীসের ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ আল আমিন মাদানী, সাবেক শিক্ষক শাইখ ডা. খুরশিদ আলম মুর্শিদ, শুব্বানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ শাইখ শরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ইমাম হাসান মাদানী, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক নাজিবুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ গাজী, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক হাফিজুর রহমান মাদানী, আইন বিষয়ক সম্পাদক মো. মাসুদুর রহমান, ক্বারার সদস্য আব্দুর রহমান মাদানী, আম সদস্য আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদপুর মডেল মাদ্‌রাসার শিক্ষক শাইখ আব্দুল্লাহ, ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদ্‌রাসা, সুরিটোলার শিক্ষক শাইখ শরিফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান মোস্তাফিজ ও আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : আল জান্নাতু তাহ্‌তা আকদামুল উম্মাহাত "মায়ের পায়ের নিচে বেহেশ্‌ত" এটি কী সহীহ হাদীস?

হাবিবুন নবী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

জবাব : আরবী ভাষায় বলা হয়– «الجنة تحت أقدام الأمهات».

"মায়ের পদতলে জান্নাত –এরূপ শব্দে এটি জাল হাদীস।" *(সিলসিলা য'ঈফাহ্- হা. ৫৯৩)*

তবে আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজাহ্'য় সহীহভাবে প্রমাণিত যে, সাহাবী জাহিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি মা আছে? সাহাবী বললেন : হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন :

«فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا».

তুমি তার (মায়ের) সেবায় নিয়োজিত থাকো। কেননা তার দুই পদতলে জান্নাত। *(নাসায়ী- ৩১০৪, ইবনু মাজাহ্- ২৭৮১)*

জিজ্ঞাসা (০২) : মহিলারা দা'ওয়াতী কাজের জন্য বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারবে কি?

আরিফ আফফান নোয়াপাড়া, যশোর।

জবাব : দীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। তদ্রুপভাবে দীনের দা'ওয়াতী কাজ নারী-পুরুষ সকলেই করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি; আমি এবং আমার অনুসারীগণ দিব্য জ্ঞানসহ আহ্বান করি; আল্লাহ মহান ও পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *(সূরা ইউসুফ : ১০৮)*

মহিলাদের দীনী দা'ওয়াতের চিত্র কী হবে, তার নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে পাওয়া যায়,

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا﴾

"তোমাদের গৃহসমূহে আল্লাহর আয়াতসমূহ যা তিলাওয়াত করা হয় এবং হিকমাত [নবী (ﷺ)-এর বাণী] যা পাঠ করা হয়, তা স্মরণ রেখে চলো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সম্যক অবগত।" *(সূরা আল আহ্যা-ব : ৩৪)*

কুরআন কারীমের উক্ত আয়াত নির্দেশ করে যে, নারী নিজ আবাসে কুরআন ও হাদীসের চর্চা করবে, পঠন-পাঠনে অংশ গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী জীবন-যাপনে মনোযোগী হবে। একজন স্ত্রী হিসেবে স্বামী গৃহে নারীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا.

"নারী (স্ত্রী) স্বামী গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫১৮৮)* হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন–

الراعي : هُوَ الْحَافِظ المؤتمن الْمُلْتَزم صَلَاح مَا قَامَ عَلَيْهِ.

الراعي হচ্ছে হিফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্য একান্ত বাধ্য। *(সুযদাতুল ক্বারী- ৬/১৯০ পৃ.)*

কোনো নারী তার নিজ পরিসরে দা'ওয়াতি কাজের আঞ্জাম দিবে এটি তার জন্য করণীয়, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদীস শাস্ত্রে বড় পারদর্শী ছিলেন। তথাপি দূর দূরান্তে গিয়ে তিনি দীনী দা'ওয়াত দিতেন এমনটি দেখা যায় না।

আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ)-এর কাছে কোনো হাদীস দুর্বোধ্য মনে হলে আমরা সে বিষয়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাসিল করতাম। *(আত্ তিরমিযী- ৩৮৮৩, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ-শাদী অনেক বিলম্বে হয়ে যায়, এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র বিধান কী?

মুশফিক রানা, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জবাব : পড়াশুনা করা কিংবা জীবনে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষে বিলম্বে বিবাহ-শাদী করা নবী (ﷺ)-এর নির্দশনার বিপরীত কাজ। সামর্থ্যের বিবেচনায় সহজসাধ্য হলে যুবক-যুবতীদের বিবাহ-শাদী বিলম্বে করা উচিত নয়। যথাসাধ্য দ্রুত বিবাহসম্পন্ন করা করণীয়। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ».

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের যার বিবাহের সামর্থ্য রয়েছে সে যেন বিবাহ করে। নিশ্চয়ই তা চক্ষুকে অধিকতর অবনমিতকারী এবং লজ্জাস্থানের জন্য অধিক সুরক্ষাকারী।" *(বুখারী- হা. ১৯০৫, মা. শা., হা. ৫০৬৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪০০)* কোনো যুবকের চারিত্রিক উৎকৃষ্টতা এবং তার দীনদারীতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার কাছে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে নবী (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। পাত্রের উচ্চমানের প্রতিজ্ঞা প্রাপ্তি এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্য নয়। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ، فَأَنْكِحُوْهُ.

"যদি এমন কেউ তোমাদের কাছে আসে তোমরা যার চরিত্র এবং ধার্মিকতায় সন্তুষ্ট তার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও।" *(জাত্ তিরমিযী- ১০৮৪, মা. শা., ১০৮৫; হাকিম- মা. শা., ২৬৯৫)*

যৌবনের উজ্জ্বল সময়কে প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে ব্যয় করে দিয়ে বিবাহের মতো মহৎ এবং হৃদয়মনের পবিত্রতা আনয়নকারী গুরুত্বপূর্ণ কাজকে পেছাতে থাকা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির কাজ নয়; বরং যৌবনের উত্তম সময়ে বিবাহ-শাদী সম্পন্ন করাতে রয়েছে অধিক কল্যাণকারিতা দীন এবং দুনিয়ার। *(আশ্ শাইখ বিন বায- মাজাল্লাতুত দা'ওয়াহ, সংখ্যা- ১১৭)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমি উমরী ক্বাযা সালাত পড়তে চাই। এটি কি সুন্নাহসম্মত?*** *তানভীর আহমেদ, কুমারপাড়া, সিলেট।*

জবাব : 'উমরী ক্বাযা ইসলামী শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং এটি মনগড়া ভিত্তিহীন 'আমল। কোনো মুসলিম দলিল ছাড়া কারো কোনো কথার ভিত্তিতে সালাতের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত করতে পারে না। কাজেই 'উমরী ক্বাযা বিদআত। আর বিদআত সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

و إياكم و محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.

"আর তোমরা নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ হতে সাবধান। কেননা সকল বিদআতই গোমরাহী।" *(বায়হাক্বী- 'শু'আবুল ঈমান', হা. ৭৫১৬)* আর সকল প্রকার বিদআতী 'আমল পরিতাজ্য। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)* –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***কোনো ভালো কাজ করে তা ফেসবুকে ছবি আপলোড করা রিয়া'র পর্যায়ভুক্ত হবে কি? ছবি আপলোডের সীমারেখা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বংশাল, ঢাকা।

জবাব : ভালো কাজের প্রচার দু'টি অর্থে হয়ে থাকে। **এক-** অপরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করা। **দুই-** লোক দেখানো বা মানুষের প্রসংশা লাভ বা আত্মপ্রচার।

প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য হলে ভালো। তবে তাক্বওয়ার পরিপন্থি কাজ। মুত্তাক্বী বা পরহেযগার ব্যক্তি এরূপ প্রচারকে পছন্দ করতেন না। সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে এরূপ অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাঁদের কাছে নিছক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় মূখ্য ছিল। পক্ষান্তরে লোক দেখানো বা আত্মপ্রকাশ উদ্দেশ্য হলে তা হবে রিয়া। আর রিয়া ছোট শির্ক। যার যে কাজে রিয়া দেখা দেবে, তার সে কাজ বা 'আমল বাত্বিল হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» قَالُوْا : وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ.

"আমি তোমাদের বেলায় সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ে ভয় করি, তা হলো ছোট শির্ক। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আরয করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন : রিয়া বা লোক দেখানো 'আমল।" *(মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৩৬৩০)* অপর বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ".

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : আমি অংশিদারদের শির্ক তথা অংশিদারিত্ব হতে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন 'আমল করবে, যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরিক করবে– আমি তাকে এবং তার শির্কী 'আমলকে প্রত্যাখান করব।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৮৫)*

আর এরূপ কাজ বেশি বেশি চলতে থাকলে বড় শির্কে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এটি মুনাফিক্বদের 'আলামতও বটে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***আমি শুনেছি "ফিরাউন নীল নদে ডুবে মারা যায়নি; বরং সে dead sea বা মৃত সাগরে পড়ে মারা গেছে" –এ বিষয়ে সঠিক তথ্য কোন্‌টি? জানিয়ে ধন্য করবেন।***

নূরুল কবীর, কালনী, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : ফিরাউনের মৃত্যুর স্থান হিসেবে আল্লাহ আল-কুরআনে 'বাহার' ও ইয়াম্ম' দু'টি শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা একই স্থান উদ্দেশ্য। তবে সে উদ্দিষ্ট স্থান কোনটি এ নিয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। কেউ সেটিকে নীলনদ আবার কেউ লোহিত সাগর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ সেটিকে dead sea বা মৃত সাগর বলেননি। কাজেই dead sea বলা একেবারেই ভিত্তিহীন। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***কখনো কখনো জামা'আতের শেষে কাউকে একাকী ফরয সালাত পড়তে দেখা যায়। তার সাথে মিলিত হয়ে জামা'আত পড়া যায় কী?***

মো. মাযহারুল ইসলাম, বগুড়া।

জবাব : আপনার বর্ণিত অবস্থায় কাউকে একাকী সালাতরত পেলে তার সাথে আপনি মিলিত হয়ে ফর্‌যের জামা'আত আদায় করবেন। এর বৈধতার দলিল বিশুদ্ধভাবেই বিদ্যমান– ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّيْ مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِيْ، فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ».

"আমি আমার খালার কাছে রাতে ছিলাম। অতঃপর নবী (ﷺ) রাতের সলাতে দাঁড়ালেন আর আমি তার বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাতে তিনি আমার মাথায় ধরে ডান পাশে দাড় করিয়ে দিলেন।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৯)*

জিজ্ঞাসা (০৮) : জুমু'আর ফরয সলাতের পর মাসজিদে কেউ কেউ দুই রাকআত সুন্নাত সলাত পড়ে, আবার কেউ কেউ চার রাকআত পড়ে। প্রশ্ন হলো– দু'টোই কী সহীহ?

খাশিউর রহমান, মঞ্জুরে ইলাহী
ডিমলা, নীলফামারী।

জবাব : জুমু'আর সলাতের পর মাসজিদে সুন্নাত সলাত পড়লে চার রাকআত সুন্নাত পড়াই সুন্নাহ সম্মত; তবে বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত আদায় করলে দুই রাকআত আদায় করবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সলাত আদায় করবে, তখন সে যেন জুমু'আর পরে চার রাকআত সলাত আদায় করে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২০৭৩, মা. শা., হা. ৬৭/৮৮১)*

আবার গৃহে গিয়ে আদায় করলে দু'রাকআত পড়ার দলিল নিম্নরূপ : ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ».

"নবী (ﷺ) বাড়ীতে না ফিরে সলাত আদায় করতেন না। অতঃপর তিনি তার বাড়িতে দু'রাকআত সলাত আদায় করতেন।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২০৭৭, মা. শা., হা. ৭১/৮৮২)*

যদিও কোনো কোনো 'আলেম জুমু'আর পরে দুই বা চার রাকআতের ইখতিয়ারের কথা বলেছেন। তথাপীও অধিকাংশ 'আলেম ও ফকীহ জুমু'আর পরে মসজিদে আদায় করলে চার রাকআত ও বাড়িতে আদায় করলে দু'রাকআত আদায় করার কথাই বলেছেন। *(যাদুল মা'আদ- ১/৪১৭)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : "আমরা জানি উম্মাতে মুহাম্মাদী ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে" –এখানে উম্মাতে মুহাম্মাদী বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে, না-কি সকল ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু সকল ধর্মের মানুষদের বুঝাবে?

মাসউদ হাসান, সাভার, ঢাকা।

জবাব : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় দু'টি মত রয়েছে। প্রথম মত– অনুযায়ী এখানে উম্মাত বলতে উম্মাতুদ দা'ওয়াহ বুঝায়। অর্থাৎ- ঐ সব লোক, যাদের প্রতি মুহাম্মাদ (ﷺ) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এরূপ অর্থ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি হতে এযাবৎকালের সব মানুষ বুঝাবে। আর দ্বিতীয় মত– অনুযায়ী মুসলিম বলে পরিচয়দানকারী উম্মাতই উদ্দেশ্য। কেননা হাদীসে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। সে বিবেচনায় দ্বিতীয় মতটিই প্রাধান্য পায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (১০) : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব মাঝে মাঝে 'ইশার সালাতের পর প্রায় ঘন্টাব্যাপী মসজিদের মাইকে তা'লীম দিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে জনৈক ব্যক্তি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইশার সালাতের পর কথা বলা পছন্দ করতেন না, এমনকি উচ্চ আওয়াজে তা'লীমও দিতেন না– ফলে তা বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে শরঈ নির্দেশনা জানিয়ে বাধিত করবেন।

হাফিযুর রহমান
সাপাহার, নওগাঁ।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইশার সালাতের পর বাক্যালাপ পছন্দ করতেন না; বরং ঘুমিয়ে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দিতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৮ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৬৪৭)*

এর অর্থ অযথা রাত জাগা এবং তাহাজ্জুদ ও ফজর সালাতে ব্যাঘাত না ঘটানো। কিন্তু কল্যাণকর কাজ তথা তা'লিম-তারবিয়্যাতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম সাহেব দীনি আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রোতাদের ধৈর্যের প্রতি খেয়াল রেখে মাঝে-মধ্যে বয়ান করবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে– মাসআলা ও মাসায়েল কঠিন আমানত। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া ফাতাওয়া দেয়া যাবে না। হাদীসের এ অংশটি পড়ে তার ব্যাখ্যা না জেনে হুটকরে একটি ফাতাওয়া জারি করা বিভ্রান্তির কারণ। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন : 'ইল্‌ম উঠে যাবে এবং মানুষেরা জাহিলদের কাছে ফাতওয়া চাইবে। তারা না বুঝে ভুল ফাতাওয়া দিয়ে নিজেরা গোমরাহ হবে এবং মানুষকে গোমরাহ করবে। *(বুখারী- হা. ১০০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৬৯৭১)*

অতএব, 'ইশার পর তা'লিম করা যাবে না মর্মে ফাতাওয়াটি ভুল। আবার প্রতিদিন আলোচনা করাটাও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) পছন্দ করতেন না। কাজেই অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ভেদে মাঝে-মধ্যে ইমাম সাহেব বা কোনো আমন্ত্রিত 'আলেম 'ইশার পর বয়ান করাতে শরঈ কোনো আপত্তি নেই। –ওয়াল্লাহু 'আলাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত সৌদি আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

(১) কিং ‘আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়

সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত তিহামাহ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর জেদ্দায় অবস্থিত একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিং ‘আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং অর্জনকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি ও প্রশাসন, আইন, মেডিসিন, তথ্য-প্রযুক্তিসহ চব্বিশটি অনুষদ। এর মধ্যে পনেরোটি অনুষদ ক্যাম্পাসে এবং নয়টি ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন কিছু কোর্সও অফার করে যা সৌদি আরবের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপলব্ধ, যেমন- সামুদ্রিক বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম রাজা, বাদশাহ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন ‘আব্দুর রহমান আল সৌদের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে একদল ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তিতে সৌদি আরবের কাউন্সিল মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। টাইমস হায়ার এজ্যুকেশন (২০২১)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১ নম্বর আরব বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। যার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংক (২০২১) : ২০১-২৫০। সৌদি আরবের র‍্যাংক (২০২১) : ১। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর কিং ‘আব্দুল ‘আযীয বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তির আওতায় সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশোনা করার সুযোগ, কোর্স চলাকালীন প্রতি মাসে মাস্টার্স প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ৩০০০ সৌদি রিয়াল (প্রায় ৯৩ হাজার বাংলাদেশি টাকা), পিএইচডি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ৪০০০ সৌদি রিয়াল (প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার বাংলাদেশি টাকা), শিক্ষা সামগ্রী কেনার জন্য আলাদা এককালীন ২৭০০ সৌদি রিয়াল যা প্রায় ৮৪ হাজার বাংলাদেশি টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার্থীদের সৌদিতে যাওয়া এবং পড়াশোনা শেষে নিজ দেশে ফেরার জন্য ফ্রি এয়ারটিকেট-এর সুবিধা প্রদান করা হয়।

(২) কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়

আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের মালভূমি নজদ অঞ্চলে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত কিংবদন্তি কিং ফয়সাল ফাউন্ডেশনের প্রথম প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি অলাভজনক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আল-ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং অর্জনকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রয়েছে একত্রিশটি দেশীয় অনুষদসহ আন্তর্জাতিক অনুষদ নিয়ে মোট দুইশতর বেশি অনুষদ যা দেশটির ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টনারশিপ রয়েছে। টাইমস হায়ার এজ্যুকেশন (২০২২)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৫তম সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্থান পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। যার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্ক (২০২১) : ২৫১-৩০০। সৌদি আরবের র‍্যাংক (২০২১) : ২। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর আল-ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তির আয়তাধীন সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশোনা করার সুযোগ, কোর্স চলাকালীন মাসিক ভাতা প্রদান, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, ফ্রী মেডিক্যাল সেবা, প্রতি একাডেমিক বছর শেষে দেশে আসা যাওয়ার জন্য ফ্রী এয়ার টিকিট। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর বই কার্গো করে দেশে নেওয়ার জন্য তিন মাসের ভাতার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

ডিসেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৫৯	০৬:২৩	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
০২	০৫:০০	০৬:২৪	১১:৪৯	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৪২
০৩	০৫:০০	০৬:২৪	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৪	০৫:০১	০৬:২৫	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৫	০৫:০২	০৬:২৬	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৬	০৫:০২	০৬:২৭	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৭	০৫:০৩	০৬:২৭	১১:৫১	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৪২
০৮	০৫:০৩	০৬:২৮	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
০৯	০৫:০৪	০৬:২৮	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
১০	০৫:০৫	০৬:২৯	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
১১	০৫:০৫	০৬:৩০	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৪৩
১২	০৫:০৬	০৬:৩০	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৩	০৫:০৬	০৬:৩১	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৪	০৫:০৭	০৬:৩২	১১:৫৪	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৪৪
১৫	০৫:০৮	০৬:৩২	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৬	০৫:০৮	০৬:৩৩	১১:৫৫	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৪৫
১৭	০৫:০৯	০৬:৩৩	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৪৬
১৮	০৫:০৯	০৬:৩৪	১১:৫৬	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৪৬
১৯	০৫:১০	০৬:৩৪	১১:৫৬	০২:৫৫	০৫:১৬	০৬:৪৬
২০	০৫:১০	০৬:৩৫	১১:৫৭	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৪৭
২১	০৫:১১	০৬:৩৬	১১:৫৭	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৪৭
২২	০৫:১১	০৬:৩৬	১১:৫৮	০২:৫৭	০৫:১৮	০৬:৪৮
২৩	০৫:১২	০৬:৩৭	১১:৫৮	০২:৫৭	০৫:১৮	০৬:৪৮
২৪	০৫:১২	০৬:৩৭	১১:৫৯	০২:৫৮	০৫:১৯	০৬:৪৯
২৫	০৫:১৩	০৬:৩৭	১১:৫৯	০২:৫৮	০৫:২০	০৬:৫০
২৬	০৫:১৩	০৬:৩৮	১২:০০	০২:৫৯	০৫:২০	০৬:৫০
২৭	০৫:১৪	০৬:৩৮	১২:০০	০২:৫৯	০৫:২১	০৬:৫১
২৮	০৫:১৪	০৬:৩৯	১২:০১	০৩:০০	০৫:২১	০৬:৫১
২৯	০৫:১৪	০৬:৩৯	১২:০১	০৩:০১	০৫:২২	০৬:৫২
৩০	০৫:১৫	০৬:৩৯	১২:০২	০৩:০১	০৫:২২	০৬:৫২
৩১	০৫:১৫	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২৩	০৬:৫৩

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক
র‍্যাংকিংভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির
সনামধন্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়
মাদরাসাতুল হাসানাহ
ভর্তি চলছে
আপনার সোনামণির সুশিক্ষার নিরাপদ ঠিকানা
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
বালক ও বালিকা পৃথক শাখা
আমাদের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম
তাহফীজুল কুরআন
মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন
ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
(ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)
উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম
আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
কুরআন শিক্ষা
দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম
পরিচালনায়
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.
বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলামের আলোকে সালাফদের মানহাজ অনুসারে চক্ষু শীতলকারী সন্তান, সুদক্ষ নাগরিক এবং আরবী, ইংরেজি ও তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ইসলামী স্কলার গড়াই জামি'আ মানারুত তাওহীদ -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

● আবাসিক ● অনাবাসিক ● ডে-কেয়ার

ভর্তি চলছে

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহীহ আকীদা ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষাদান।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রদান।
- অ্যাক্টিভিটি বেইসড লার্নিং সিস্টেম।
- আরবী ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টেক্সটবুক অনুসরণে পাঠদান।
- ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড/ক্যামব্রিজ এর কারিকুলাম অনুসরণ।
- বিশুদ্ধ ইবাদতের প্রশিক্ষণ ও ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করণ।
- কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সম্পন্নকারীদের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহির্বিশ্বে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ ইনশাআল্লাহ।

বিভাগসমূহ

- ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
  প্লে থেকে নবম শ্রেণী
- তাহফীযুল কুরআন বিভাগ
  প্রি-তাহফীয ও তাহফীয
- হিফয শুনানী ও ইসলামী শিক্ষা শর্ট কোর্স
- সার্টিফিকেট কোর্স (অনলাইন)
  আরবী ভাষা ও অন্যান্য

সফলতার দ্বিতীয় বছর

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

জামি'আ মানারুত তাওহীদ

জামি'আ মানারুত তাওহীদ
JAMIA MANARUT TAWHEED

ক্যাম্পাস: হাউজ- ৫২, রোড- ১৫, সেক্টর- ১৪, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০
017500 300 27, 017500 300 91 www.jmtawheed.com
jamiamanaruttawheed@gmail.com jamiamanaruttawheed Jamia Manarut Tawheed

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত